উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা

চতুর্থ সমেস্টার

ঐচ্ছিকপত্র – ৪০৩

বৈষ্ণব সাহিত্য

পর্যায় – ক

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:

The Registrar,

University of North Bengal,

Raja Rammohunpur,

P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,

West Bengal, Pin-734013,

India.

Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008

Fax: (0353) 2776313, 2699001

Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in

Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

FOREWORD

The Self Learning Material (SLM) is written with the aim of providing simple and organized study content to all the learners. The SLMs are prepared on the framework of being mutually cohesive, internally consistent and structured as per the university's syllabi. It is a humble attempt to give glimpses of the various approaches and dimensions to the topic of study and to kindle the learner's interest to the subject

We have tried to put together information from various sources into this book that has been written in an engaging style with interesting and relevant examples. It introduces you to the insights of subject concepts and theories and presents them in a way that is easy to understand and comprehend.

We always believe in continuous improvement and would periodically update the content in the very interest of the learners. It may be added that despite enormous efforts and coordination, there is every possibility for some omission or inadequacy in few areas or topics, which would definitely be rectified in future.

We hope you enjoy learning from this book and the experience truly enrich your learning and help you to advance in your career and future endeavours.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

<u>পর্যায় – ক</u>

একক ১ - বিদ্যাপতির পদাবলী: স্থান-কাল প্রেক্ষিত প্রসঙ্গ

একক ২ - বিদ্যাপতি ও তাঁর পদাবলীর পরিচয়

একক ৩ - বিদ্যাপতির পদ বিশ্লেষণ

একক ৪ - বিদ্যাপতির পদাবলীর বিভিন্ন দিক বিচার

একক ৫ - চণ্ডীদাসের পদাবলী : স্থান-কাল প্রেক্ষিত পরিচয়

একক ৬ - চন্ডীদাসের পদ বিশ্লেষণ

একক ৭ - চণ্ডীদাসের পদাবলীর বিভিন্ন দিক বিচার

<u>পর্যায় – খ</u>

একক ৮ - গোবিন্দদাসের পদাবলী: স্থান-কাল প্রেক্ষিত প্রসঙ্গ

একক ৯ - কবি পরিচয় ও পদ বিশ্লেষণ

একক ১০ - গোবিন্দদাসের পদাবলীর বিভিন্ন দিক বিচার

একক ১১ - চৈতন্য ভাগবত: স্থান-কাল প্রেক্ষিত প্রসঙ্গ

একক ১২ - কবি ও তাঁর কাব্যের পরিচয়

একক ১৩ - চৈতন্যভাগবত: পাঠ ও আস্বাদন

একক ১৪ - চৈতন্যভাগবত- এর বিভিন্ন দিক ও আঙ্গিক বিচার

ঐচ্ছিকপত্র – ৪০৩ বৈষ্ণব সাহিত্য

একক ১

বিদ্যাপতির পদাবলী: স্থান-কাল প্রেক্ষিত প্রসঙ্গ- বিদ্যাপতির পদ পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়ার কারণ, পঞ্চদশ শতকে মিথিলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, পঞ্চদশ শতকে মিথিলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, পঞ্চদশ শতকে মিথিলার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট।

একক ২

বিদ্যাপতি ও তাঁর পদাবলীর পরিচয়- বিদ্যাপতির পরিচয় , বিদ্যাপতির সাহিত্যকর্ম , বিদ্যাপতির পদাবলী , বিদ্যাপতির গ্রন্থসমূহ ও পদাবলীর পুথি অনুসন্ধান , বিদ্যাপতির মুদ্রিত গ্রন্থের পরিচয় , বিদ্যাপতি সম্পর্কে সমালোচকদের অভিমত।

একক ৩

বিদ্যাপতির পদ বিশ্লেষণ - উদ্দেশ্য , বিদ্যাপতির পদের বয়ঃসন্ধি , বিদ্যাপতির পদে পূর্বরাগ , বিদ্যাপতির পদে অনুরাগ , বিদ্যাপতির পদে অভিসার , বিদ্যাপতির পদে মান , বিদ্যাপতির পদে বিরহ , বিদ্যাপতির পদে ভাবসম্মিলন , বিদ্যাপতির প্রার্থনা বিষয়ক পদ , বিদ্যাপতির পদে শ্রীরাধা চরিত্র , বিদ্যাপতির পদে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র।

একক ৪

বদ্যিাপতরি পদাবলীর বভিন্নি দকি বচিার - বদ্যিাপতরি পদসজ্জা ও গঠনরীতি, বদ্যিাপতরি পদরে ভাষা, বদ্যিাপতরি পদরে ছন্দ , বদ্যিাপতরি পদরে অলংকার , বদ্যিাপতরি পদে সংগীত।

<u>একক ৫</u>

চণ্ডীদাসরে পদাবলী : স্থান-কাল প্রক্ষেতি পরচিয় - চন্ডীদাস সমস্যা , চন্ডীদাসরে কাল , চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে বাংলার রাজনতৈকি প্রক্ষোপট , চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে বাংলার সামাজকি-সাংস্কৃতকি ও ধর্মীয় প্রক্ষোপট , চন্ডীদাসরে পরচিয় , চন্ডীদাসরে পদ সংগ্রহ।

<u>একক ৬</u>

চন্ডীদাসরে পদ বশ্লিষেণ - উদ্দশ্যে , চন্ডীদাসরে পদে পূর্বরাগ ও অনুরাগ , চন্ডীদাসরে পদে অভসিার , চন্ডীদাসরে পদে বাসকসজ্জা , চন্ডীদাসরে পদে মান , চন্ডীদাসরে পদে প্রমে বচৈত্যি , চন্ডীদাসরে পদে আক্ষপোনুরাগ , চণ্ডীদাসরে পদে ভাবসম্মলিন।

<u>একক ৭</u>

চণ্ডীদাসরে পদাবলীর বভিন্নি দকি বচিার- চন্ডীদাসরে পদে রাধা চরত্রি , বদ্যিাপতি ও চন্ডীদাসরে তুলনা ,

চন্ডীদাসরে পদরে ভাষা, চন্ডীদাসরে পদরে ছন্দ ও অলংকার।

একক: ১ : বিদ্যাপতির পদাবলী: স্থান-কাল প্রেক্ষিত প্রসঙ্গ

বিন্যাসক্রম

১.১। বিদ্যাপতির পদ পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়ার কারণ

১.২। পঞ্চদশ শতকে মিথিলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

১.৩। পঞ্চদশ শতকে মিথিলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

১.৪। পঞ্চদশ শতকে মিথিলার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট

১.৫। অনুশীলনী

১.৬। গ্রন্থপঞ্জি

১.১। বিদ্যাপতির পদ পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়ার কারণ

বৈষ্ণব পদাবলীকে বলা যায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুকুটমণি। কৃষ্ণ-বিষয়ক এবং চৈতন্য বিষয়ক বিভিন্ন পদই বৈষ্ণব পদাবলী। বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে সর্বাগ্রে যাঁর নাম অবিসংবাদিত ভাবে উচ্চারিত হয়, তিনি হলেন কবি সার্বভৌম জয়দেব। যদিও তিনি সংস্কৃত ভাষাতে রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর কাব্যের নাম ‘গীতগোবিন্দ’ । তা শিথিল আখ্যান সূত্রে গ্রথিত কাব্যের আধারে লেখা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদের সমবায়ে বিন্যস্ত।

কবি জয়দেবের পর বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায় কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করে বৈষ্ণব পদাবলীর মূল ভিত্তি স্থাপন করেন। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি বাঙালি না হওয়া সত্ত্বেও ব্রজবুলি ভাষায় যে পদ

রচনা করেন তা বাঙালির প্রাণের কথা, যার মাধ্যমে ভক্ত-ভগবানের মধ্যে নিবিড় আন্তরিকতা ঘোষিত হয়েছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে আবতীর্ণ হয়েছেন। সেই শ্রীচৈতন্যদেব জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করতেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে লিখেছেন-

'চন্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি

করণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।

স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রদিনে

গান শুনে পরমআনন্দ।।'

ফলে বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে যে অপ্রাকৃত রসতত্ত্ব রয়েছে, তা যথার্থরূপে শ্রীচৈতন্যদেব আস্বাদন করে আপামর বাঙালিকে আস্বাদনে উদ্বুদ্ধ করেছেন। সুতরাং বৈষ্ণব পদকর্তা বিদ্যাপতি যদি পাঠ্যতালিকাভুক্ত না হতেন, তাহলে বাঙালি পাঠককূল একটি অনির্বচনীয় আনন্দ-রসসুধা থেকে বঞ্চিত হত। সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে তাঁর আসামান্য প্রভাব আমরা জানতেও পারতাম না। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিদ্যাপতিপদে মুগ্ধ। প্রায় চারশো বছর ধরে বিদ্যাপতি বাঙালির কীতনগানকে জাগিয়ে রেখেছেন। বাংলায় ছাত্রছাত্রীদের তা জানা বড় জরুরি ছিল । তাই বিদ্যাপতি পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

১.২। পঞ্চদশ শতকে মিথিলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

আতি প্রাচীনকাল থেকেই মিথিলা অঞ্চলের মানুষ বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনাশক্তির জন্য প্রসিদ্ধ; কিন্তু রাজনৈতিক দিক দিয়ে মিথিলা গৌতম বুদ্ধের সময় থেকে মগধের আধিপত্যকে স্বীকার করে নিয়েছিল। গুপ্তরাজাদের আমল থেকেই মাথিলার নিজস্ব কোনো রাজা না থাকায়, সর্বদাই একটা রাজনৈতিক অস্থিরিতার মধ্যে দিন কাটত। তবে আশ্চর্যের বিষয়, এই রাজনৈতিক অস্থিরিতার মধ্যেও মিথিলা তার নিজস্ব সংস্কৃতি বজায় রাখতে পেরেছিল।

মথিলার রাজনতৈকি অস্থরিতার একটি অন্যতম কারণ মুসলমান শাসকদরে আগ্রাসী মনোভাব । নভিীক কর্নাট বংশীয় নবীন রাজা হরসিংহদবেরে আমলে গয়িাসুদ্দনি তুঘলক ১৩২৩ খ্রস্টাব্দে মথিলিা আক্রমণ ও অধকিার করনে। কন্তিু তনিি স্পষ্ট অনুভব করনে, উত্তরভারতরে অন্যান্য অঞ্চলরে মত মথিলিায় মুসলমান সুবদোররে প্রত্যক্ষ শাসন সম্ভব নয়। এর ফলস্বরূপ ফরিোজ শাহ্ তুঘলক মথিলিা বা তরিহুত রাজ্যরে দায়ত্বি রাজপণ্ডতি কামশেশ্বর ঠাকুররে হাতে তুলে দনে। এই কামশেশ্বর ঠাকুর ও তাঁর বংশধরদরে পূর্ণ সমর্থন করনে বদি্যাপতরি পরবিার। বদি্যাপতরি পরবিাররে আদবিাস ছলি মজঃফরপুর জলোর পুসার কাছে উন্নত গ্রাম ঐনতিে।

সুদূর দক্ষণি থকেে আগত কর্নাটকরে নন্যদবে, যনিি ছলিনে বদিগ্ধ পণ্ডতি, সাহত্যি কলাবদি্যার অনুরাগী, তনিি মথিলিায় নজি রাজ্য প্রতষ্ঠিা করনে। তাঁর ছয়পুরুষ বংশানুক্রমকিভাবে দক্ষতার সঙ্গে মথিলিায় রাজত্ব করনে। যখন বদৈকি ও বৌদ্ধ মতবাদরে সংঘর্ষে নবহন্দিুত্ববাদ গাড়ে উঠছ,ে পাশাপাশি মুসলমান আক্রমণ আনবিার্য হয়ে উঠছ,ে এরকমই রাজনতৈকি সংকটরে মধ্যে উন্নত ও উদার কর্নাটদরে পতন হতে থাকে। কর্নাটদরে পতনরে সাতাশ বছর পরে এবং মথিলিায় ঐনবরা শাসনকালরে এক দশকরে মধ্যে বদি্যাপতি জন্ম গ্রহণ করনে।

বদি্যাপতরি পূর্বপুরুষরো কর্নাট রাজার দরবারে বশি্বস্ত ও উচ্চ দায়ত্বিপূর্ণ পদে আসীন ছলিনে। তাঁদরে কউে শান্তি ও যুদ্ধ সংক্রান্ত বভিাগরে মন্ত্রী, কউে ছলিনে মহাসমন্তাধপিতি, কউে ছলিনে রাজার সভাসদ্। তবে ঐনবরাদরে দল্লিীশ্বর ভক্তরি জন্য প্রথমে মথিলিাবাসীরা এদরে গ্রহণ করতে পারে নি। মথিলিার ইতহিাসে ভবসংিহই ঐনবরা রাজবংশরে প্রথম রাজা। ভবসংিহরে পুত্র দবেসংিহ, তাঁর পুত্র শবিসংিহ। এই শবিসংিহ এবং তাঁর স্ত্রী লছমিা দবেী ছলিনে বদি্যাপতরি পৃষ্ঠপোষক; এঁদরে সঙ্গে বদি্যাপতরি সম্পর্ক ছলি বশি্বাস ও আন্তরকিতার।

১.৩। পঞ্চদশ শতকে মিথিলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

নবপ্রতিষ্ঠিত ঐনবরা রাজবংশের সঙ্গে বিদ্যাপতি সারাজীবন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এবং এই রাজপরিবারের চারপুরুষের সাতজন রাজার সভাকক্ষ তিনি অলঙ্কৃত করেন।

১৩২৩ খ্রিস্টাব্দে হরসিংহদেবের পরাজয়ের পর মিথিলায় কর্নাট শাসন শেষ হয়। তারপর শুরু হয় ঐনবরা বংশের শাসনকাল। তবে ঐনবরা বংশের কাউকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজা হিসাবে স্বীকার করার আগে কামেশ্বর ঠাকুরের হাতে রাজ্যের ভার দেওয়া হয়। কামেশ্বরের পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ চলতেই থাকে, শুরু হয় হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। বিদ্যাপতির এই সময়কার সর্বাধিক বিতর্কিত রচনা 'কীর্তিলতা'। এই গ্রন্থানুযায়ী এই সময় চলে চরম অরাজকতা। এর মধ্যে কামেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র ভবসিংহ সম্পূর্ণ রাজ্য হস্তগত করে 'তিরহুত' নাম গ্রহণ করেন, যাঁকে সক্রিয় সমর্থন করেন বিদ্যাপতির পূর্বপুরুষ বৃদ্ধ ও প্রাজ্ঞ চণ্ডেশ্বর। মিথিলার ইতিহাসে ভবসিংহই ঐনবরা রাজবংশের প্রথম রাজা।

মিথিলায় নতুন সমাজব্যবস্থা প্রচলিত হবার পর বিদ্যাপতির পরিবার নিজেদের 'বিষিবৌর' নামে অভিহিত করত, কারণ বিদ্যাপতির জন্মস্থান বিসফি গ্রাম। তাঁর বংশধররা দীর্ঘকাল এই গ্রামেই বাস করেছেন ও 'ঐনবরা' রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন। বিদ্যাপতির পরিবার রাজানুকূল্য লাভ করায় স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের আর্থিক সচ্ছলতা ছিল যথেষ্ট। কিন্তু কেবল একটি পরিবারের সচ্ছলতার উপর নির্ভর করে না সমগ্র মিথিলার অর্থনৈতিক চালচিত্রের রূপ। দীর্ঘকাল যুদ্ধবিগ্রহ, মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করা, নিজেদের সামাজিক ভিত্তি সুদৃঢ় করতে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা এবং রাজনৈতিক অস্থিরিতার কারণে মিথিলার অর্থনৈতিক কাঠামো কখনই বলিষ্ঠ রূপ লাভে সমর্থ হয়নি। তবে উন্নত শিক্ষা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন হওয়ায় মিথিলায় নতুন আদর্শ ও আইন প্রণয়নের ফলে সামাজিক বিধিব্যবস্থা ও জাতিভেদে অনুযায়ী ব্যক্তিগত ন্যায়নীতি নিয়ন্ত্রিত হত। জীবনাদর্শের প্রতিটি বৃত্তে পঞ্চদশ শতকের মিথিলাবাসীর বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয় - তবে সমাজব্যবস্থার সে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন ঘটেছিল অতীতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই। ভোগবাদ

প্রতিষ্ঠা না পাওয়ায় মোটামুটি সহজ অর্থনৈতিক বিকাশই সেখানে পরিলক্ষিত হয়।

ঐনবরার উল্লেখযোগ্য রাজা শিবসিংহ যখন রাজ্য সুদৃঢ় করার চেষ্টা করেন, সেই সময় থেকে শিবসিংহের রাজত্বকালের শেষ দিনটি পর্যন্ত বিদ্যাপতি অতি বিশ্বস্ত বন্ধু ও বিজ্ঞ মন্ত্রণাদাতা হিসাবে তাঁর সঙ্গে ছিলেন। রাজা শিবসিংহ প্রথম জীবনে দিল্লীশ্বরের বশ্যতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মেনে নিলেও পরবর্তীকালে নিজেকে স্বাধীন রাজা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন। ফলে তাঁকে বহু যুদ্ধ করতে হয়, যার অধিকাংশতেই তিনি জয়লাভ করেন। এরকমই একটি যুদ্ধে যাত্রা করে তিনি আর ফিরে আসেননি। কর্নাটবংশীয় হরসিংহ ও ঐনবরার রাজা শিবসিংহ যুদ্ধনীতিকেই কাম্য বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং দু-জনেই প্রবল পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষের কাছে পর্যুদস্ত হয়েছিলেন; যার ফল স্বাভাবিক ভাবেই মিথিলার অর্থনীতির উপর পড়েছিল।

১.৪। পঞ্চদশ শতকে মিথিলার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট

মিথিলার সাংস্কৃতিক বাতাবরণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির ছিল বলেই মিথিলাবাসী বরাবরই স্বাধীন থাকতে চেয়েছেন। সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন সবতেই তারা সমৃদ্ধ ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আর্যাবর্তের অবশিষ্টাংশ যখন মুসলমান শাসনের অধীনে, মিথিলায় তখন পরিপূর্ণ ও উন্নত সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল। এরই ফলে মিথিলাতে রেনেসাঁস বা শিল্পসাহিত্যের নবজীবনের সূচনা। মিথিলার পণ্ডিত লক্ষ্মীধর রচনা করেন বিখ্যাত নীতিসংহিতা ‘কল্পতর’, গঙ্গেশ প্রণয়ন করেন দর্শনশাস্ত্রের মূল্যবান গ্রন্থ ‘তত্ত্বচিন্তামণি’। এইসব গ্রন্থের বৈদগ্ধ্য দেশ-কালের সীমারেখা ছাড়িয়ে যায়।

নবইন্দুত্ব যখন বৌদ্ধমতকে অঙ্গীভূত করে বৈদিক ও বৌদ্ধ মতবাদের সংঘর্ষকে সংযত করেছে এবং জাতিগত ক্ষত্রীয় বিভাজন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে - এরকম এক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে কর্নাটরা মিথিলায় রাজ্যস্থাপন করেন। তখন থেকে নতুন ধরনের সামাজিক মূল্যবোধ প্রাধান্য পেতে শুরু করে। পুরানো বিধিনিষেধ, রীতি-নীতির নতুন ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে থাকে সমাজ।

তবে অতীতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই সমাজ ব্যবস্থার এই পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন।

মূলত বিদ্যাপতির কালই মিথিলার সাংস্কৃতিক স্বর্ণযুগ; সারা আর্যাবর্ত থেকে শিক্ষার্থীরা মিথিলায় আসছে বিদ্যার্জনের আশায়। বিদ্যাপতির নিজের বাড়িতে আসছেন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, মনীষীগণ; আলোচনা করছেন শাস্ত্র, ধর্ম রাজনীতি, দেশাচার ও সামাজিক মূল্যবোধ নিয়ে।

আর্যাবর্তের অন্যান্য স্থানের মত মিথিলাও সনাতন হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী। মুসলমান আগ্রাসনের শিকার হলেও মিথিলা তার মূল ধর্মবিশ্বাস থেকে সরে যায় নি। সে ধর্মবিশ্বাস - বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। কখনো কখনো ঈশ্বরতত্ত্বগত বিতর্কে বৈষ্ণব-শাক্ত বা বৈষ্ণব-শৈব বিভেদ নিজেদের মধ্যে দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে। আবার প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মিথিলাবাসী নিজেদের সুস্থিতি ও অস্তিত্বের স্বার্থে আধ্যাত্মিক ঐক্য অনুভবের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছে। বিদ্যাপতি নিজের জীবন চরণের মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মের এই আধ্যাত্মিক ঐক্যকে অনুভব করেছেন এবং বিভিন্ন পদে তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কেউ তাঁকে বলেছেন, তিনি বিষ্ণুর উপাসক, কেউ বলেছেন শৈব। কিন্তু বিদ্যাপতি একটি অতি সাধারণ ধর্মমত পোষণ করতেন, সেটি হল- 'একজনই আছেন যিনি সর্বশক্তিমান এবং ত্রিভুবনে এমন কিছুই নেই যা তিনি সৃষ্টি করেন নি' ('পুরুষপরীক্ষা', চতুর্থ অধ্যায়, ৫ম পদ) এবং 'শুধুমাত্র নামেই তাঁদের স্বতন্ত্র মহিমা' ('পুরুষপরীক্ষা', চতুর্থ অধ্যায়, ১০ম পদ)। বিদ্যাপতি তাঁর পদেও হর ও হরির মধ্যে কোনো বিভেদ রাখেন নি। বিদ্যাপতি তাঁর 'শৈবসর্বস্বসার' গ্রন্থের ভূমিকাতে নানা শাস্ত্রের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে- হর ও হরি অভিন্ন এবং একের উপাসনা অন্যের উপাসনাই সূচিত করে মাত্র। ধর্মবিশ্বাসে বিদ্যাপতি শৈব হলেও হরির প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা।

ধর্মগত ঐতিহ্যে বিদ্যাপতি শৈব হলেও যে কোনো স্মার্ত মৈথিলের মতো তিনি পঞ্চদেবোপাসক ছিলেন। মিথিলার অধিবাসীরা বহু দেব-দেবীতে ভক্তি করেন; বিদ্যাপতি তার মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করতে পেরেছিলেন। তাঁর শিবভক্তির পদগুলি সাধারণ নারীপুরুষকে জাতিধর্মনির্বিশেষে আকর্ষণ করত। অনুমান করা যায়, পঞ্চদশ শতকে মিথিলায় শিবপূজার প্রচলনই অধিক

ছিল। কারণ সর্বজনগ্রাহ্যতার বিভিন্ন দিকগুলির বিচারে হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী পরমাত্মার স্বরূপ রূপে শিবই ভক্ত-ভগবানের ঐশ্বর্যাত্মক ভাবানুযায়ী অনেকে নৈকট্যের। তথাপি বিষ্ণু উপাসনার ধারাটিও প্রবলভাবে প্রবাহিত ছিল। কারণ কবি জয়দেবে রাধাকৃষ্ণ উপাসনাকে ভাগবত পুরাণানুসারে যে প্রেমময় ভূমিতে আপন উপলব্ধিতে প্রত্যক্ষ রূপে স্থাপন করে গেছেন, তা উপেক্ষা করার ক্ষমতা কারো ছিল না, তবু বিদ্যাপতির কালেও যেন রাধাকৃষ্ণ লৌকিক শৃঙ্গার রসাত্মক আবহ কাটিয়ে মাধুর্যাত্মক ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ভাগবতের 'এতে চাংশ কলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্' - এই তত্ত্বকে উপলব্ধি বিদ্যাপতি ও তাঁর সমকাল করতে পারেনি বলেই তাঁর পদাবলীর ধারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অনুগামী নয়, এমন কি সেখানে দার্শনিক লীলাতত্ত্ব প্রকট নয়।

১.৫। অনুশীলনী

১। বিদ্যাপতি পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়ার কারণগুলি আলোচনা করুন।

২। পঞ্চদশ শতাব্দীর মিথিলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করুন।

৩। পঞ্চদশ শতাব্দীর মিথিলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করুন।

৪। পঞ্চদশ শতাব্দীর মিথিলার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট আলোচনা করুন।

৫। বিদ্যাপতিকে বাংলা সাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত করার যৌক্তিকতাগুলি আলোচনা করুন।

৬। স্থানকাল প্রেক্ষিতের গুরুত্ব বিবেচনা করে বিদ্যাপতির প্রতিভার মূল্যায়ন করুন।

৭। মিথিলার যে রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিদ্যাপতির আবির্ভাব, তার বিশদ আলোচনা করুন।

৮। মিথিলার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট বিদ্যাপতির সাহিত্যকে কীভাবে এবং কতটা প্রভাবিত করেছিল আলোচনা করুন।

৯। পঞ্চদশ শতাব্দীর মিথিলার রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট আলোচনা করুন।

১.৬। গ্রন্থপঞ্জি

১। বিদ্যাপতির পদাবলী- খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত

২। পাঁচশত বৎসরের পদাবলী- বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত

৩। ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য- বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত

৪। বৈষ্ণব পদাবলী- খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও সুকুমার সেন সম্পাদিত

৫। বৈষ্ণব পদাবলী- (সাহিত্য সংসদ) হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

৬। বৈষ্ণব পদ সংকলন- দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

৭। বৈষ্ণব পদাবলী- সুকুমার সেন সম্পাদিত

৮। বৈষ্ণব পদাবলীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ- পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

৯। চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি- শঙ্করীপ্রসাদ বসু

১০। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত- (প্রথম খণ্ড) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

একক: ২ : বিদ্যাপতি ও তাঁর পদাবলীর পরিচয়

বিন্যাসক্রম

২.১। বিদ্যাপতির পরিচয়

২.২। বিদ্যাপতির সাহিত্যকর্ম

২.৩। বিদ্যাপতির পদাবলী

২.৪। বিদ্যাপতির গ্রন্থসমূহ ও পদাবলীর পুথি অনুসন্ধান

২.৫। বিদ্যাপতির মুদ্রিত গ্রন্থের পরিচয়

২.৬। বিদ্যাপতি সম্পর্কে সমালোচকদের অভিমত

২.৭। অনুশীলনী

২.৮। গ্রন্থপঞ্জি

২.১। বিদ্যাপতির পরিচয়

বিহারের দ্বারভাঙা জেলার মধুবনি মহকুমায় মিথিলার প্রাণকেন্দ্র বিসফি গ্রামে বিদ্যাপতির জন্ম। বিদ্যাপতির বংশধররা এই বিসফি গ্রামেই দীর্ঘকাল বসবাস করতেন। তিনশো বছর আগে তাঁরা মধুবনির কাছে সৌরথ গ্রামে বাস করতে থাকেন এবং তাঁর বংশধররা এখনও সেখানেই আছেন।

বিদ্যাপতির জন্মকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা বিতর্ক আছে। কেউ বলেন ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে বা তার কাছাকাছি সময়ে বিসফি গ্রামে তাঁর জন্ম, কারো মতে আনুমানিক ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাপতির বিসফি গ্রামে জন্ম। তবে ড. বিমানবিহারী মজুমদারের মতে বিদ্যাপতির জীবনকাল মোটামুটি ১৩৮০ থেকে ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। তাঁর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করে জানা যায়, তিনি একাধারে কবি, শিক্ষক, কাহিনিকার, ঐতিহাসিক, ভূবৃত্তান্তলেখক ও স্মার্ত নিবন্ধকার হিসাবে ধর্মকর্মের ব্যবস্থাদাতা ও আইনের প্রামাণ্য গ্রন্থের লেখক ছিলেন।

বিদ্যাপতির বংশগত উপাধি ‘ঠাকুর’ যার অর্থ জমিদার। তাঁর জন্ম শুরু যজুর্বেদ শাখার গোত্রভুক্ত মাধ্যন্দিন শাখার আন্তর্গত মৈথিলি ব্রাহ্মণ পরিবারে । এঁদের আদিবাস ছিল মজঃফরপুর জেলার পুসার কাছে সমৃদ্ধ গ্রাম এনীতে। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে, বিদ্যাপতির জন্ম কর্নাটদের পতনের সাতাশ বছর পরে এবং মিথিলায় ঐনবরা শাসনকালের এক দশকের মধ্যে। বিদ্যাপতির পরিবারের প্রসিদ্ধি ছিল বিদ্বান-রাজপুরুষের পরিবার হিসাবে; জ্ঞান ও পান্ডিত্যের জন্য, বিশেষ করে শাস্ত্রীয় জ্ঞানের জন্য তাঁর পরিবার বিখ্যাত ছিল। তাঁর পূর্বপুরুষেরা কর্নাট রাজার দরবারে বিশ্বস্ত ও উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্বয়ং বিদ্যাপতি ঐনবরা রাজবংশের শাসক রাজা শিবসিংহের স্বতঃস্ফূর্ত পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন।

স্বাধীনতা-প্রিয় রাজা শিবসিংহ নিজেকে স□-সাহসী ও লোকপ্রিয় রাজা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বাংলা ও পাটনার মুসলমান নবাবদের সঙ্গে বহুবার যুদ্ধে লিপ্ত হন ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে জয়লাভ করেন। সম্ভবত জৌনপুরের ইব্রাহিম শাহের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন এবং তাঁকে আর জীবিত বা মৃত কোনো অবস্থাতেই খুঁজে পাওয়া যায়নি। বন্ধু রাজা শিবসিংহের অবর্তমানে প্রতিশ্রুতি মতো বিদ্যাপতি শিবসিংহের পত্নীদের নিয়ে স্বেচ্ছা নির্বাসনে যান সপ্তরিতে (বর্তমানে নেপালে)। দীর্ঘ বারো বছর বিদ্যাপতি অতি বিশ্বস্ততার সঙ্গে নেপালে তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং শাস্ত্রবিধান অনুযায়ী রাজার শেষকৃত্য করে রাজার পত্নীদের বৈধব্য গ্রহণ পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে কাটান। শিবসিংহের নিরুদ্দিষ্ট হবার বত্রিশ বছরেরও বেশি পরে তিরহুতের রাজা ধীরসিংহের আমলে আশি বছরেরও বেশি বয়সে বিদ্যাপতি পরলোকগমন করেন।

বিদ্যাপতির পিতার নাম গণপতি, মাতার নাম জানা যায়নি। বিদ্যাপতির দুই বিবাহ; প্রথম পত্নীর গর্ভে দুই পুত্র, দুই কন্যা এবং দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে এক পুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। বিদ্যাপতির জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম হরপতি, যিনি জ্যোতিষবিদ্যার উপরে ‘দৈবজ্ঞবান্ধব’ নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। বিদ্যাপতির বংশধরেরা আজও মধুবনির কাছে সৌরাঠ গ্রাসে বসবাস করেন। বর্তমানে সৌরাঠের বাসিন্দারা হলেন বিদ্যাপতির বংশের ষোড়শতম বংশধর।

মন্তব্য

বিদ্যাপতির শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ছিল প্রবল। তাঁর বিদ্যানুরাগের ক্ষেত্র ছিল বিস্তৃত, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার। শাস্ত্রবিদ্যা অনুধাবন করবার জন্য প্রথানুগামী ছাত্রাবস্থা ত্যাগ করে তিনি পিতৃপিতামহের বংশানুক্রমিক বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং জীবন ও কর্ম নিয়োজিত করেন নিজের দেশ ও দেশবাসীর উদ্দেশে। ছাত্রাবস্থা ত্যাগ করলেও অক্লান্ত পরিশ্রম ও সুগভীর আগ্রহে তিনি নানাবিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ, আগম, তন্ত্র, ধর্মশাস্ত্র ও বিচিত্র নিবন্ধ পাঠ করেছেন তিনি। তাছাড়া কাব্য-নাটক সম্পর্কেও তাঁর গভীর চর্চা ছিল- যার প্রকাশ তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্যে অনুরণিত হয়েছে। এছাড়াও শিবসিংহের রাজসভায় বিদ্যাপতি সভাপন্ডিতের পদ অলংকৃত করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিধি ছিল বিস্তৃত, তাঁর উদার বহুমুখী প্রতিভা কোনো বিশেষ সীমায় আবদ্ধ থাকেনি। পারিবারিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে বিদ্যাপতি সংস্কৃত ভাষায় প্রথম সাহিত্য 'ভূপরিক্রমা' রচনা করেন- যা দেশীয় বিবরণ ও লোককথার এক বিচিত্র সংমিশ্রণ। এই রচনা থেকে তাঁর জীবনাদর্শ সম্পর্কে স্পষ্ট একটা ধারণা পাওয়া যায়।

বিদ্যাপতির মাতৃভাষা ছিল মৈথিলি। এই ভাষাতে তিনি হরগৌরী-বিষয়ক ও রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ রচনা করেছিলেন। তবে 'ব্রজবুলি' ভাষায় রচিত অমৃত মধুর বৈষ্ণব পদাবলীর জন্যই তাঁর সম্যক পরিচিতি। এই কারণেই তাঁকে 'মৈথিলি কোকিল' বলা হয়ে থাকে। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর কাব্যের রস আস্বাদন করতেন-

'বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।

এই তিন গীতে করয়ে প্রভুর আনন্দ।।'

কবি জয়দেব যেমন সংস্কৃত ভাষায় রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিয়য়ক গীতিকাব্য রচনার ধারা প্রবর্তন করেন, বিদ্যাপতি তেমন লৌকিক ভাষায় রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলী রচনা করেছেন। তাই তাঁকে বলা হয়ে থাকে 'অভিনব জয়দেব'। তবে জয়দেবের মতো তিনি নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব ছিলেন না, তিনি ছিলেন পঞ্চোপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ। তবে প্রথম জীবনে বিদ্যাপতি শৈব থাকলেও, ধীরে ধীরে তিনি বৈষ্ণব ধর্মে অনুরাগী হয়ে পড়েছিলেন । বিদ্যাপতি তাঁর পদে হর ও হরির মধ্যে কোনো বিভেদ রাখেননি, তিনি মনে করতেন হর ও হরি অভিন্ন।

২.২। বিদ্যাপতির সাহিত্যকর্ম

একটি বংশানুক্রমিক রাজ-আভিজাত্য ও ঐতিহ্যময় পান্ডিত্যের বাতাবরণে বিদ্যাপতির সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাত যৌবনের প্রথমভাগে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা ‘ভূপরিক্রমা’- এটি একটি পৌরাণিক ধাঁচের সংস্কৃত গদ্য ও কাব্যের সংকলন। ঐনবরার রাজা দেবসিংহের অনুগামী হিসাবে নৈমিষারণ্যে বসেই রচনা করেন এই গ্রন্থ- যাতে নৈমিষারণ্য থেকে মিথিলা বা তিরহুতের দীর্ঘ যাত্রাপথের বিবরণের সঙ্গে সংকলিত হয়েছে বেশ কয়েকটি কাহিনি।

বিদ্যাপতি ছিলেন অসাধারণ পান্ডিত্যের ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। বিভিন্ন ভাষায় তিনি পারঙ্গম ছিলেন। মাত্র চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সে তিনি গিয়াসউদ্দিন ও নসর□ শাহকে উ□সর্গ করে পদ লিখেছেন। কবি কালিদাস ও জয়দেবের প্রতি ছিল তাঁর সুগভীর অনুরাগ। ‘ভূপরিক্রমা’র আগে তিনি রচনা করেন ‘মণিমঞ্জরী’ যা ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম্’, ‘উত্তর-রামচরিত’ ও ‘রত্নাবলী’র প্রভাবে রচিত। সংস্কৃত ভাষায় স্মৃতিশাস্ত্র সম্পর্কিত যে সমস্ত বিচার-গ্রন্থ তিনি রচনা করেন, সেগুলি হল – ‘বিভাগসার’ ও ‘দানবাক্যাবলী’; পূজাবিষয়ক গ্রন্থগুলির মধ্যে- ‘দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিনী’ ‘ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিনী’ ‘গঙ্গাবাক্যাবলী’ ও ‘বর্ষক্রিয়া’। এছাড়া ‘পুরুষ-পরীক্ষা’ নামক একখানি অভিনব গ্রন্থ রচনা করেন তিনি যাতে কথাসাহিত্যেরও অনেক গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলছেন- “যে গানে তাঁহার খ্যাতি, যে গানে তাঁহার প্রতিপত্তি, যে গানে তিনি জগ□ মুগ্ধ রাখিয়াছেন, তিনি যদি তাহার একটি গানও না লিখিতেন, কেবল পণ্ডিতের মত স্মৃতি, পুরাণ, তীর্থ গেজেটিয়ার প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন তাহা হইলেও বলিতে হইত, তাঁহার প্রতিভা উজ্জ্বল ও সর্বতোমুখী।”

বিদ্যাপতি এত বিচিত্র বিষয়ের গ্রন্থ রচনা করেছেন ভাবলে অবাক হতে হয়। ‘ভূপরিক্রমা’, ‘কীতলিতা’, ‘পুরুষপরীক্ষা’, ‘কীর্তিপতাকা’, ‘লিখিনাবলী’, ‘শৈবসর্বস্বসার’, ‘গঙ্গাবাক্যাবলী’, ‘বিভাগসার’, ‘দানবাক্যাবলী’, ‘দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী’ অর্থা□ ভূগোল, ইতিহাস, ন্যায়, স্মৃতি, নীতি ও পত্ররীতি তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। এছাড়াও আছে অজস্র বৈষ্ণব ও শৈবপদ।

বিদ্যাপতি ছিলেন সময়ের তুলনায় আধুনিক-মনস্ক, দূরদর্শী ও বিচক্ষণ। তাই ভেবেছিলেন, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষা অবহট্ঠ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করার কথা। ‘কীর্তিলতা’ ও ‘কীর্তিপতাকা’ নামক ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ দু-খানি অবহট্ঠ ভাষাতেই রচিত। আর মাতৃভাষা মৈথিলিতে রচনা করলেন বেশকিছু হরগৌরী-বিষয়ক ও রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ। অবহট্ঠ-জাত ‘অপ্রাকৃত’ বা ‘অলৌকিক’ তথা শিল্প রচনার উদ্দেশ্যে কৃত্রিমভাবে নির্মিত সাহিত্যিক ভাষা 'ব্রজবুলি'তে রচনা করলেন অমৃত-মধুর বৈষ্ণব পদাবলী, যা তাঁকে সমধিক দেশকালাতীত খ্যাতির অধিকারী করেছে।

বিদ্যাপতি ছিলেন রাজ সভাকবি। তিনি অলঙ্কার ও স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপনাও করেছেন। আবার গল্পে নীতিকথা বলার আদর্শে তিনি ‘পুরুষপরীক্ষা’ রচনা করেছেন, যা সংস্কৃত গদ্য ও কাব্যের সংমিশ্রণ। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় তিনি ‘গোরক্ষবিজয়’ নামক নাটক রচনা করেন; এই নাটকে তিনি মৈথিলি ভাষায় গীত রচনা করেন।

পরিণত বয়সে বিদ্যাপতি রচনা করেন বিপুল সংখ্যক প্রেমগীতি, যেখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। সেটি হল- ‘প্রকৃত পুরুষের মধ্যে সমস্ত দেহলক্ষণ ছাড়াও যা থাকে তা হল এক আদর্শ কল্পনা, যা ব্যতীত পুরুষ লাঙ্গুলবিহীন পশুমাত্র। (পুরুষপরীক্ষা) পুনরায় তিনি বলেন- ‘মনুষ্য দেহধারী জীবদেহ খুঁজে পাওয়া সহজ, কঠিন হল সত্যিকারের মানুষের সন্ধান পাওয়া।’ (পুরুষপরীক্ষা)

শিবসিংহের রাজত্বকাল (১৪১০-১৪ খ্রিস্টাব্দ) বিদ্যাপতির কাব্যরচনার ‘সুবর্ণযুগ’ বলা যায়। রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক অধিকাংশ পদাবলী (দুই শতাধিক) বা প্রেমবিষয়ক গীতি এই সময়েই রচিত। ১৪৩০-৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি রচনা করেন শিবের উপাসনামূলক গ্রন্থ ‘শৈবসর্বস্বসার’। তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ‘গঙ্গাবাক্যাবলী’ যেখানে গঙ্গাতটের বিভিন্ন তীর্থস্থান ও ধর্মীয় দিক সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। বিদ্যাপতির সর্বশেষ গ্রন্থ ‘দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী’; এর বিষয়বস্তু হল মিথিলার জনপ্রিয় দুর্গোৎসব।

সর্বশেষে উল্লেখ করতে হয় বিদ্যাপতির রচনার ভাষা-বৈচিত্র্য। সংস্কৃত, অবহট্ঠ, মৈথিলি, ব্রজবুলিতে সাহিত্য। রচনা করে তিনি সর্বজন-চাহিদা

মটিয়িছেনে। মুখ্যত তাঁর প্রমে-পদাবলীর জন্যই বশ্বিজনীন আবদেন। সত্যহি তনিি অমর প্রমেরে পদকর্তা।

২.৩। বদ্যিাপতরি পদাবলী

শ্রীচতৈন্যদবেরে আবর্ভিাবরে পূর্বে বষ্ণৈব পদাবলীর যে সমৃদ্ধ ধারাটি তরৈি হয়ছেলি, বদ্যিাপতি তার অন্যতম রূপকার। অসাধারণ পান্ডত্যিরে অধকিারী বদ্যিাপতি বচিত্র বষিয়ে বহু গ্রন্থরে রচয়তিা হলওে মুখ্যত পদাবলী সাহত্যিরে জন্যই তাঁর সমধকি প্রসদ্ধি ও খ্যাতি।

বদ্যিাপতি ছলিনে মথিলিার অধবিাসী, মথৈলি তাঁর মাতৃভাষা । এই মথৈলি ভাষাতওে তনিি হরগৌরী-বষিয়ক ও রাধাকৃষ্ণ-বষিয়ক বশে কছিু পদ রচনা করছেলিনে। তবে বদ্যিাপতি বষ্ণৈব পদাবলী 'ব্রজবুলি' ভাষায় রচনা করছেলিনে। তাঁর পদাবলী শ্রীচতৈন্য মহাপ্রভু মুগ্ধ হয়ে আস্বাদন করতনে; ফলে আপামর বাঙালি হয়ে উঠছেলিনে তাঁর গুণমুগ্ধ পাঠক। রসশাস্ত্রে বদ্যিাপতরি ছলি পরপূির্ণ অধকিার; সইে সঙ্গে রাজসভার পরবিশে ও ত□কালীন নাগরকি রসরুচি তাঁর অন্তজগতে যে রূপলোকরে সৃষ্টি করছেলি তাতে তাঁর ব্যক্তগিত রসরুচি যুক্ত হয়ে রাধাকৃষ্ণরে লীলা রচনায় রসরে উদ্বোধন ঘটয়িছেলি। যহেতেু হরগৌরীর দাম্পত্য জীবনে মধুর রস সৃষ্টরি অবকাশ কম, তাই রাধাকৃষ্ণ-বষিয়ক প্রমে পদাবলি রচনায় তনিি অধকি আকৃষ্ট হয়ছেনে। নষ্ঠিাবান বষ্ণৈব না হওয়া সত্ত্বওে মনরে দকি থকেে তনিি যে বষ্ণৈব ভাবাপন্ন ছলিনে, এমন কী প্রমেময় মাধবরে কাছে আত্মসমর্পণ ও তাঁর প্রমেলীলাকে আস্বাদনরে মাধ্যমইে যে মানবমনরে সমৃদ্ধমিয় মুক্তি - একথা তনিি উপলব্ধি করছেলিনে। তবে চণ্ডীদাস যমেন প্রথম থকেে শষে পর্যন্ত ভাবালুতায় আচ্ছন থকেছেনে, বদ্যিাপতরি ক্ষত্রেে তমেন হয়নি। রাজসভার সাজ-সজ্জা, সৌন্দর্যবলিাসরে অভজ্ঞিতায় ললতি কবি বদ্যিাপতি প্রথমে রূপলোক দয়িইে শুরু করছেনে, পরে অবশ্য সইে ভাবলোকইে উত্তীর্ণ হয়ছেনে; তাই শষে পর্যায়ে পরম ভক্ত বষ্ণৈব কবরি সঙ্গে তাঁর আর কোনো পার্থক্য থাকে না।

বদ্যিাপতরি পদাবলী মূলত তনি শ্রণেভিুক্ত-

প্রথমত, মথিলিার সামাজকি অনুষ্ঠানে গীত পারবিারকি দবেতার মঙ্গলস্তোত্র সম্বলতি পদ;

দ্বিতীয়ত, ভগবান শিব-বিষয়ক পদাবলী - এতে শিবের বিবাহ ও পারিবারিক জীবন বর্ণিত আছে। এই জাতীয় পদের এক বিশেষ ধরন প্রবর্তন করেন বিদ্যাপতি; যার নাম 'নাচারি'।

তৃতীয়ত, রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলী; যার জন্য বিদ্যাপতির খ্যাতি ও সম্যক পরিচিতি।

বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলী বিভিন্ন পর্যায় অবলম্বনে রচিত। প্রথম পর্যায়ভুক্ত পদগুলিতে সৌন্দর্য-সাধনাই কবির লক্ষ্য। এই পর্যায়ে রয়েছে- (১) বয়ঃসন্ধি, (২) পূর্বরাগ, (৩) অভিসার, (৪) মিলন, (৫) মান বিষয়ক পদ।

দ্বিতীয় পর্যায়ের পদগুলিতে আছে বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডলে সুগভীর ব্যঞ্জনা। এই পর্যায়ে রয়েছে- (১) মাথুর বা বিরহ, (২) ভাবসম্মিলন বা ভাবোল্লাস, (৩) রসোদ্গার, (৪) রূপানুরাগ বিষয়ক পদ। এই পর্যায়ের পদে বিদ্যাপতির অলংকার প্রয়োগের নৈপুণ্য চমৎকার; এখানে অপূর্ব সৌন্দর্য-সৃষ্টির উল্লাস লক্ষিত হয়।

আর তৃতীয় পর্যায়ের পদ- 'প্রার্থনা' বিষয়ক পদ। 'প্রার্থনা' বিষয়ক পদ রচনায় বিদ্যাপতি একক এবং অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী।

২.৪। বিদ্যাপতির গ্রন্থসমূহ ও পদাবলীর পুথি অনুসন্ধান

বিদ্যাপতি চৈতন্য-পূর্ব যুগের কবি। বিদ্যাপতি বাঙালি না হলেও বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর শুরু বিদ্যাপতি থেকেই। বিদ্যাপতি রচিত বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা 'ব্রজবুলি' নামক অবহট্ঠজাত এক 'অপ্রাকৃত' অথা কাব্যরচনার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত এক তথাকথিত কৃত্রিম শৈল্পিক ভাষা। বিদ্যাপতি ছিলেন মৈথিল রাজাদের সভাকবি। রাজানুগ্রহ সাত্ত্বেও তাঁর রচিত পদাবলী যথার্থ রূপে রক্ষিত হয়নি। মিথিলার রাজনৈতিক অস্থিরতা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ, আন্তর্কলহ নানা কারণে তাঁর পদাবলীর পুঁথি বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছিল।

অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদার নানা পুঁথি বিচার-বিশ্লেষণ করে বিদ্যাপতির অকৃত্রিম পদরূপে সাতশো নিরানব্বইটি পদের উল্লেখ করেছেন।

কবকিন্ঠহার, সরসকবি, নবজয়দবে বা অভনিব জয়দবে, ভূপতি সংিহ, নবকবশিখের উপাধি-ভণতিায় বদি্যাপতরি অনকে পদ পাওয়া যায়।

শবিভক্তরি উপর বদি্যাপতি অনকে গীত রচনা করছেনে - মথিলিায় তাঁর খ্যাতরি এটি একটি অন্যতম কারণ। এছাড়া তাঁর মৌলকি সৃজনশীল সাহত্যিরে মধ্যে প্রথম হল 'কীর্তপিতাকা'। এই রচনাটরি একটমিাত্র ভূর্জপত্র-পান্ডুলপিি নপোলরে কাঠমান্ডুতে বীর পুস্তকাগারে আছে। এটি আবষ্কিার করনে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। দ্বতিীয় রচনাটি হল 'পুরুষ পরীক্ষা', যা 'গোরক্ষবজিয়'এর সমসাময়কি। এই বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করনে শ্রীরামপুররে জনকৈ এইচপি রায় ১৮১৫ খস্টিাব্দে; এর একটি সংস্করণ প্রকাশতি হয়ছে লন্ডন থকেে ১৮২৬ খ্রস্টিাব্দে; যার রচয়তিা স্যর জি. হটন।

বদি্যাপতরি পদাবলীর একটি বড় অংশ পাওয়া যায় নপোলরে মল্লরাজাদরে রাজসভায়। বশেকছিু পদাবলীর পুঁথি আসামওে পাওয়া যায়। ১৪০৬ খ্রস্টিাব্দ নাগাদ বদি্যাপতি 'কীর্তলিতা' রচনা করনে, যখোনে শবিসংিহরে অন্তধান ও পরাজয়রে ঘটনার উল্লখে করনে। এই রচনাটরি পাঁচটি বভিন্নি সংস্করণ প্রকাশতি হয়ছে এবং পণ্ডতিরো ব্যক্তগিত মতামতও জানয়িছেনে।

বদি্যাপতি রচতি 'পুরুষ পরীক্ষা' ছাড়া অন্য কোনো পাণ্ডুলপিি মথিলিায় সুলভ নয়। তবে পদাবলীর কছিু পুঁথি মথিলিায় পাওয়া গছে। দ্বারভাঙ্গার সংস্কৃত বশ্বিবদি্যালয়রে গ্রন্থাগারে তাঁর স্বহস্তে রচতি শ্রীমদ্ভাগবতরে অনুলপিটিি সযত্নে রক্ষতি আছ।ে

বদি্যাপতরি আর একটি শ্রমসাধ্য রচনা হল 'দানবাক্যাবলী'; এটি বারাণসীতে ১৮৮৩ খ্রস্টিাব্দে প্রথম প্রকাশতি হয়। বদি্যাপতি রচতি সর্বশষে গ্রন্থ 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গনিী'। মথিলিাধপিতি ধীরসংিহরে ভাই ভরৈবসংিহরে আদশোনুসারে এই বইটি সংকলতি হয়। 'কীর্তলিতা', 'কীর্তপিতাকা', 'গোরক্ষবজিয়' এর পান্ডুলপিি নপোলে পাওয়া যায়। 'ভূপরক্রিমা'র একমাত্র পান্ডুলপিটিি সংরক্ষতি আছে কলকাতার সংস্কৃত কলজে।ে 'শবৈসর্বস্বসার'-এর একটি অসমাপ্ত পান্ডুলপিি আছে দ্বারভাঙায়, অখন্ডটি আছে নপোল।ে

বদি্যাপতরি পদাবলী সম্পর্কে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, সটেি হল বদি্যাপতরি নামে উদ্ধৃত পদরে প্রামাণ্যতা। পদে 'ভণতিা' উল্লখে থাকায়

বোঝা যায় সেটি কার পদ; কিন্তু কয়েক শতক ধরে লোকমুখে পদাবলী প্রচারিত হতে থাকায় ভণিতাগুলি ভ্রান্তিপূর্ণ ও অকারণ সংযোজিত হয়েছে। এমনকি সব পদাবলীতে ভণিতাও নেই। বহু সংকলনে, বিশেষত নেপালে স্থানাভাবের কারণে ভণিতাগুলি বাদ গেছে। সুতরাং বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পূর্ণ সংকলন করা সম্ভব হয় নি। বিদ্যাপতি নিজে কখনও তাঁর রচনা সংগ্রহ করে রাখেননি। লোকমুখে তাঁর পদাবলী ছড়িয়ে গেছে মিথিলা, বাংলা, ওড়িশা, আসাম, নেপালে।

বিদ্যাপতি পদাবলী সংকলনের উদ্যোগ সর্বপ্রথম দেখা গেছে বাংলায়। বিদ্যাপতির পদাবলীর সর্বাধিক আলোচনা ও বিস্তৃত সংস্করণ প্রস্তুত করেছেন ড. বিমানবিহারী মজুমদার। 'বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ'ও বিদ্যাপতির পদসংকলন প্রকাশে সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছে। ড. সুভদ্র ঝা নেপালে সংরক্ষিত এক ভূর্জপত্র পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে বিদ্যাপতির পদসংকলন বলে প্রকাশ করেছেন।

এর আগে পণ্ডিত শিবনন্দন ঠাকুর মিথিলায় খুঁজে পাওয়া বিদ্যাপতির পদাবলীর একটি পান্ডুলিপি প্রকাশ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে লোচন কর্তৃক 'রাগতরঙ্গিনী' নামক মৈথিলি সংগীতের একটি সংকলন প্রকাশিত হয়, যেখানে বিদ্যাপতি রচিত তিপ্পান্নটি পদাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। পণ্ডিত রমানাথ ঝা নেপাল থেকে প্রাপ্ত 'ভাষাগীত সংগ্রহ' শীর্ষক একটি পান্ডুলিপি প্রকাশ করেছেন; যেখানে সাতাত্তরটি পদাবলীর রচয়িতা বিদ্যাপতি। এছাড়া মিথিলা থেকে পাওয়া আরও দুটি পান্ডুলিপির সন্ধান পেয়েছেন রমানাথ ঝা, যেখানে তিনশোটি পদ বিদ্যাপতির রচিত। বর্তমানে 'মিথিলা পদাবলী'র একটি সমালোচনামূলক সংস্করণ প্রকাশের অপেক্ষায় আছে, যার নেতৃত্বে রয়েছেন পণ্ডিত রমানাথ ঝা।

এছাড়া ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'মৈথিলিপদসংগ্রহ'-এ গ্রিয়ার্সন বিদ্যাপতির ছিয়াত্তরটি রাধাকৃষ্ণ লীলাপদ উদ্ধৃত করেছেন; এই পদগুলি তিনি দ্বারভাঙ্গার মহারাজার গৃহে পেয়েছেন। বিদ্যাপতির পদাবলীর সর্বাধুনিক কালানুক্রমিক পদসংকলন 'বিদ্যাপতি' গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন অধ্যাপক সারদাচরণ মিত্র। পরবর্তী আরও অনেক বাঙালি মনীষী বিদ্যাপতির

পদাবলীর পুঁথি অনুসন্ধান করেছেন এবং তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন নামে গ্রন্থাকারে তা প্রকাশও করেছেন।

২.৫। বিদ্যাপতির মুদ্রিত গ্রন্থের পরিচয়

বিদ্যাপতি দীর্ঘজীবী ছিলেন। আশি বছরেরও বেশি জীবদ্দশায় তিনি বিচিত্র নানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এই কবির বাংলাদেশে খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি মূলত রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলীর জন্য । মিথিলার এই কবি ছিলেন একজন বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত ব্যক্তি।

কিশোরকাল থেকে বিদ্যাপতি সাহিত্যরচনা শুরু করেন। মাত্র চোদ্দ - পনেরো বছর বয়সে তিনি গিয়াসউদ্দিন ও নসর□ সাহকে উ□সর্গ করে পদ রচনা করেছেন। যৌবনের প্রথমভাগে ১৪০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নৈমিষারণ্যে থাকাকালীন রচনা করেন 'ভূপরিক্রমা'। ১৪০২-০৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কীর্তিসিংহের পিতৃরাজ্য মিথিলা উদ্ধার সম্পর্কে লেখেন ঐতিহাসিক কাব্য 'কীর্তিলতা'। নীতিকথা বলার আদর্শে রচনা করেন 'পুরুষপরীক্ষা'।

বিদ্যাপতি বহু গ্রন্থের প্রণেতা হলেও সবগ্রন্থ মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয় নি। 'কীর্তিপতাকা'র ভূর্জপত্র-পান্ডুলিপি নেপালের কাঠমান্ডুতে আবিষ্কার করেন হরপ্রসাদ শান্ত্রী। এলাহাবাদের ড. জয়কান্ত মিশ্র এই পান্ডুলিপির একটি সংস্করণ মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করেছেন। বিদ্যাপতির প্রথম রচনা 'ভূপরিক্রমা' থেকে বেশ করেকটি কাহিনি ও আারো কিছু কাহিনি নিয়ে রচিত 'পুরুষপরীক্ষা' গ্রন্থটি ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন শ্রীরামপুরের এইচ.পি.রায় । লন্ডন থেকে ১৮২৬ সালে স্যর জি. হটন এই গ্রন্থটির একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। পরবর্তীকালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পণ্ডিত রমানাথ ঝা-র সম্পাদনায় 'পুরুযপরীক্ষা' গ্রন্থটি মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় 'কীর্তিলতা' গ্রন্থটি মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়। ঝাঁসি থেকে ড. বাসুদেব শরণ আগরওয়ালের সম্পাদনায় 'কীর্তিলতা' গ্রন্থটি মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়। পরবতীকালে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রমানাথ ঝাও 'কীর্তিলতা' গ্রন্থটির সম্পাদনা করেন।

বিদ্যাপতির পদাবলীর বিভিন্ন সংস্করণ মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাপতির পদাবলীর দেবনাগরি সংস্করণ সম্পাদনা

করেন এন. গুপ্ত। এই গ্রন্থে প্রকাশিত গানে বিদ্যাপতি হরি ও হরের মধ্যে কোনো বিভেদ রাখেননি ('হরগৌরী পদাবলী' নং ৬)। শিবের উপাসনামূলক 'শৈবসর্বস্বসার' মিথিলাবাসীদের কাছে পরম আদৃত গ্রন্থ হলেও এটি এখনও মুদ্রিত আকারে প্রকাশ পায়নি। এই গ্রন্থের পান্ডুলিপি দ্বারভাঙ্গা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এবং কাঠমাণ্ডুর বীর লাইব্রেরিতে রক্ষিত আছে। 'গঙ্গাবাক্যাবলী' গ্রন্থটি ড. জে. বি. চৌধুরীর সম্পাদনায় 'কনট্রিবিউশনস্ অব উইমেন টু স্যান্সক্রিট লিটারেচার শীর্ষক গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে পণ্ডিত ফণী শর্মার সম্পাদনায় 'দানবাক্যাবলী' গ্রন্থটি বারাণসী থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বিদ্যাপতির শেষ গ্রন্থ 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিনী' ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে দ্বারভাঙ্গার রাজ প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়, আর এক গ্রন্থ 'লিখিনাবলী', দ্বারভাঙ্গা থেকে আশি বছর আগে মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ড. ইন্দ্রকান্ত ঝা-র সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে অনেকে বাঙালি মনীষী বিদ্যাপতির পদাবলী গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করেন। এর মধ্যে জগদ্বন্ধু ভদ্র 'বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাসের পদাবলী', অধ্যাপক সারদাচরণ মিত্রের 'বিদ্যাপতি' গ্রিয়ারসন সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদসংকলন যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য।

২.৬। বিদ্যাপতি সম্পর্কে সমালোচকদের অভিমত

বিদ্যাপতি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব না হওয়া সত্ত্বেও রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ রচনায় যে ভাবদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা অতুলনীয় । ভক্তি-ভাবাপ্লুত ভক্তমনের রসরুচির নিবৃত্তি ও প্রেমের চরম সীমায় পৌঁছাতে বিদ্যাপতি তাঁর পদাবলীর যে স্বতন্ত্র ধারা নির্মাণ করেছেন তা নিরবধিকাল সহৃদয় রসিকজনের আস্বাদ্য। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেবও তাঁর পদাবলী আস্বাদন করে তৃপ্তি পেতেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে লিখেছেন-

'চন্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।

স্বরূপ-রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে

গান শুনে পরম আনন্দ।।’

বলা যায়, বিদ্যাপতির পদাবলীর শ্রেষ্ঠ সমালোচক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি তাঁর পদাবলীর রসনির্যাস আস্বাদনে নিজে আনন্দ পেতেন ও আপামর বাঙালিকে আনন্দ পেতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

বিদ্যাপতির কাব্যের মানবিক আবেদন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। কেবল ধর্মীয় আবেদন নয়, বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তরিন্দ্রিয়ের আবেদন দিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র জয়দেব ও বিদ্যাপতির কাব্য আস্বাদনের তুলনা করেছেন- “জয়দেবের গীত রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ; বিদ্যাপতির গীত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়পূর্ণ। জয়দেব ভোগ, বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতির দুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা। জয়দেবের কবিতা উ□ফুল্লকমলজালশোভিত বিহঙ্গমাকুল স্বচ্ছ বারিবিশিষ্ট, সুন্দর সরোবর; বিদ্যাপতির কবিতা দূরগামিনী বেগবতী তরঙ্গসঙ্কুলা নদী। জয়দেবের কবিতা স্বর্ণহার, বিদ্যাপতির কবিতা রুদ্রাক্ষমালা। জয়দেবের গান মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকন্ঠগীতি; বিদ্যাপতির গান সায়াহ্নসমীরণের নিশ্বাস।”

১৮৮৮ খ্রিস্টান প্রকাশিত সমালোচনা-গ্রন্থের অন্তর্গত ‘চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি’ প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন- “বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চন্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চন্ডীদাস প্রেমকেই জগ□ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চন্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চন্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাহার সুখের মধ্যেও ভয় এবং দুঃখের প্রতিও অনুরাগ। বিদ্যাপতি কেবল জানেন যে মিলনে সুখ ও বিরহে দুঃখ, কিন্তু চন্ডীদাসের হৃদয় আরো গভীর, তিনি উহা অপেক্ষা আরো অধিক জানেন।”

বিদ্যাপতি ছিলেন অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, তিনি ছিলেন বহু ভাষাবিদ্, বিশেষ করে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিচিত্র বিষয়ের উপর বিদ্যাপতির অসাধারণ দক্ষতা দেখে একালের মনীষী মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন- “যে গানে তাঁহার খ্যাতি, যে গানে তাঁহার প্রতিপত্তি, যে

গানে তিনি জগৎ মুগ্ধ রাখিয়াছেন, তিনি যদি তাঁহার একটি গানও না লিখিতেন কেবল পণ্ডিতের মত স্মৃতি, পুরাণ, তীর্থ ও গজেটেয়ার প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন তাহা হইলেও বলিতে হইত, তাঁহার প্রতিভা উজ্জ্বল ও সর্বতোমুখী।"

বিদ্যাপতিকেই বৈষ্ণব পদসাহিত্যের আদি কবি বলে অভিহিত করা হয়। ড. সুকুমার সেনের মতে- "বাঙালি বৈষ্ণব গীতিকবিদের রচনার আদর্শ ছিল বিদ্যাপতির গান। এ বিদ্যাপতিকে মিথিলার বাসিন্দে একজন রাজকবি মনে করা উচিত হইবে না। এখানে 'বিদ্যাপতি' এক ধরনের গীতি-রচয়িতা কবিদের সাধারণ নাম। এ কবিদের মধ্যে মৈথিলি ছিল, বাঙালি ছিল, সম্ভবতঃ নেপালীও ছিল। তবে তাহাদের মধ্যে উল্লেখ্যতম যিনি তিনিই আমাদের জানা কবি, 'সপ্রক্রিয়াসদুপাধ্যায়' বিদ্যাপতি ঠাকুর।"

বিদ্যাপতি সৌন্দর্যের কবি, প্রেমের কবি, বিদ্যাপতির মুক্ত মনের কবি চেতনায় মাধব ও শিবি, হরি ও হর একই আত্মার দুই দেহলীলা-বিলাসমাত্র। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মতে- "বিদ্যাপতি তীব্র ইন্দ্রিয়রাগের কবি, তথাপি ভোগ সম্বন্ধে তাঁহার মনে বিতৃষ্ণা গভীর হইয়া উঠিয়াছিল, অন্তত শেষ জীবনে, এবং তিনি প্রেমের কল্যাণময় গার্হস্থ্যরূপকেও মানিতেন।..... একদিকে ছিল বিদ্যাপতির ইন্দ্রিয়বিলাস, নাগরিক ক্ষুধার তৃপ্তি খাদ্য সরবরাহ, - যেখানে, এমনকি রাধাকৃষ্ণ পর্যন্ত রূপজীবী, অন্যদিকে আছে বিদ্যাপতির শিবি-পার্বতীর মঙ্গলসুন্দর প্রেমোদর্শ, এবং রাধাকৃষ্ণপ্রেমের উন্নত উদাত্তরূপ। .....বিদ্যাপতি আধ্যাত্মিকতা বর্জিত নন, কিন্তু তাঁহার আধ্যাত্মিকতা লৌকিক প্রেমের উন্নয়নের সৃষ্টি।"

বিদ্যাপতির প্রতিভার ব্যাপকতায় বিস্মিত শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর 'চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' গ্রন্থে জোরের সঙ্গে বলেন- "কেবল মধ্যযুগের পূর্বভারতে নয়, আধুনিক-পূর্ব ভারতের সমগ্র কবি সমাজে বিদ্যাপতি আসন দাবি করিতে পারেন এবং সৌন্দর্য ও প্রেম-মনস্তত্ত্বের কবিরূপে ভাষা-সাহিত্যে তিনি সম্ভবত অদ্বিতীয়।"

সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলাদেশে বৈষ্ণব পদাবলীর যে বিপুল কাব্য সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, বিদ্যাপতি সেই কাব্যভান্ডারকে বহু অমূল্য রত্নরাজি দ্বারা পূর্ণ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বে বৈষ্ণব পদসাহিত্যের

প্রমোম্তরে সইে মূল ভত্তিভিূমি প্রতষ্ঠিার অন্যতম উজ্জ্বল রূপকার কবি বদ্যিাপতি।

২.৭। অনুশীলনী

১। বদ্যিাপতরি জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করুন।

২। বদ্যিাপতরি সাহত্যিকর্ম সম্পর্কে সংক্ষপেে আলোচনা করুন।

৩। বদ্যিাপতরি পদাবলীর বভিন্নি পর্যায় সম্পর্কে আালোচনা করুন।

৪। বদ্যিাপতরি গ্রন্থ ও পদাবলীর পুঁথি অনুসন্ধান সম্পর্কে সংক্ষপেে আলোচনা করুন।

৫। বদ্যিাপতি সম্পর্কে সমালোচকদরে অভমিতগুলি সংক্ষপেে আলোচনা করুন।

৬। বদ্যিাপতরি মুদ্রতি গ্রন্থগুলি সম্পর্কে বশিদ আলোচনা করুন।

৭। বভিন্নি সমালোচকরে মন্তব্যে বদ্যিাপতরি সাহত্যি প্রতভিার নানাদকি কভিাবে স্পষ্ট হয়ে উঠছেে আলোচনা করুন।

৯। নানাবধি কারণে বদ্যিাপতরি পুঁথি চতুর্দকিে ইতস্তত ছড়য়িি-ছটিয়িি গছে,ে সইে পুঁথরি অনুসন্ধান সম্পর্কে বস্তিৃত আলোচনা করুন।

১০। প্রাকচতৈন্যযুগরে বষ্ণৈব পদকর্তা বদ্যিাপতরি সম্যক সাহত্যিকীর্তরি পরচিয় দনি।

২.৮। গ্রন্থপঞ্জি

১। বদ্যিাপতরি পদাবলী- খগনে্দ্রনাথ মত্রি ও বমিানবহিারী মজুমদার সম্পাদতি

২। পাঁচশত ব□সররে পদাবলী- বমিানবহিারী মজুমদার সম্পাদতি

৩। ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহত্যি- বমিানবহিারী মজুমদার সম্পাদতি

৪। বষ্ণৈব পদাবলী- খগনে্দ্রনাথ মত্রি ও সুকুমার সনে সম্পাদতি

৫। বষ্ণৈব পদাবলী- (সাহত্যি সংসদ) হরকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

৬। বষ্ণৈব পদ সংকলন- দবেনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদতি

মন্তব্য

৭। বৈষ্ণব পদাবলী- সুকুমার সেন সম্পাদিত

৮। বৈষ্ণব পদাবলীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ- পরশেচন্দ্র ভট্টাচার্য

৯। চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি- শঙ্করীপ্রসাদ বসু

১০। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত- (প্রথম খণ্ড) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

একক: ৩ : বিদ্যাপতির পদ বিশ্লেষণ

বিন্যাসক্রম

৩.১। উদ্দেশ্য

৩.২। বিদ্যাপতির পদে বয়ঃসন্ধি

৩.৩। বিদ্যাপতির পদে পূর্বরাগ

৩.৪। বিদ্যাপতির পদে অনুরাগ

৩.৫। বিদ্যাপতির পদে অভিসার

৩.৬। বিদ্যাপতির পদে মান

৩.৭। বিদ্যাপতির পদে বিরহ

৩.৮। বিদ্যাপতির পদে ভাবসম্মিলন

৩.৯। বিদ্যাপতির প্রার্থনা বিষয়ক পদ

৩.১০। বিদ্যাপতির পদে শ্রীরাধা চরিত্র

৩.১১। বিদ্যাপতির পদে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র

৩.১২। অনুশীলনী

৩.১৩। গ্রন্থপঞ্জি

৩.১। উদ্দেশ্য

কবিকুলপতি বিদ্যাপতি থেকেই বাংলাসাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর শুরু বলা যায়। পদাবলী কাব্য বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাষ্য হরে ওঠার আগেই বিদ্যাপতি

মন্তব্য

নিজস্ব উপলব্ধিতে সুগভীর আন্তরিকতায় তা রসময় করে তুলেছেন। প্রাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত গ্রামীণ কবিতায় পরিবেশিত রাধাকৃষ্ণের যে লৌকিক প্রণয়কাহিনী মধুর রসাত্মক হয়ে উঠেছিল, বিদ্যাপতি তাঁর বিদগ্ধ চিত্ত ও অনুভবী কল্পনায় তাকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দান করলেন। একটি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদ হল – ‘আনুখন মাধব মাধব সুমরিতে সুন্দরী ভেলী মধাই’ - সর্বক্ষণ মাধবকে স্মরণ করতে করতে সুন্দরী মাধবে পরিণত হল। বিদ্যাপতিও তেমনই বৈষ্ণব না হলেও মাধবকে নিয়ে পদাবলী লিখিতে লিখিতে বৈষ্ণবে পরিণত হলেন।

বিদ্যাপতির পদ বিশ্লেষণ করে তাঁর রূপমুগ্ধতা, সৌন্দর্যলোক, আত্মসমর্পণের চিত্রটি স্পষ্ট করাই এই এককটির উদ্দেশ্য। তাঁর সৃষ্ট রাধা ক্রমবিবর্তিত হয়ে কিভাবে পরিণত হয়ে উঠেছে, কিংবা তাঁর কৃষ্ণচরিত্রের স্বরূপই বা কেমন - এই এককের মাধ্যমে সেটিও আমরা জানব।

বিদ্যাপতির পদাবলীর বিভিন্ন পর্যায়। যেমন - বয়ঃসন্ধি, পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন, মান, মাথুর, ভাবসম্মিলন,রূপানুরাগ, প্রার্থনা বিবিধ বিষয়ক পদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা - এই এককের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৩.২। বিদ্যাপতির পদে বয়ঃসন্ধি

বিদ্যাপতির প্রথম স্তরের পদাবলীর মধ্যে সৌন্দর্য-সাধনাই মুখ্য। কবির এই স্তরের পদাবলীর মধ্যে বয়ঃসন্ধি, পূর্বরাগ ও অভিসার উল্লেখযোগ্য।

বয়ঃসদ্ধির পদ-রচনায় বিদ্যাপতি অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী। 'বয়ঃসদ্ধি'কে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের কোনো পর্যায়ভুক্ত না করা হলেও রসবেত্তাগণ এর গুরুত্বকে অস্বীকার করতে পারেন নি। বিশেষ করে বিদ্যাপতির রচনা কৌশলের অভিনবত্বে শৈশব ও যৌবনের সন্ধিকালের এই সংকটময় মুহূর্ত তীক্ষ্ন মনস্তাত্বিকের আঙ্গিকে কাব্যসুষমামন্ডিত হয়ে উঠেছে। বয়ঃসদ্ধির পদ রচনায় বিদ্যাপতির মৌলিকত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উল্লাস, বেদনা, হাসি-কান্না বিমিশ্র ভাবপ্রকাশে কিশোর দেহে মনে যৌবন উন্মেযে যে বিচিত্র পরিবর্তন দেখা দেয়, তাই বয়ঃসন্ধির পদের বৈশিষ্ট্য। শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধিকালের দেহ-মনের দ্বন্দ্ব বিদ্যাপতি অসাধারণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন-

‘শৈশব যৌবন দরশন ভেল।

দুহুঁ দলবলে দ্বন্দ্ব পড়ি গেল।।

কবহুঁ বাঁধয় কচ কবহু বিথারি।

কবহুঁ ঝাঁপয় অঙ্গ কবহুঁ উঘারি।।’

বিদ্যাপতি বাস্তব বোধসম্পন্ন শিক্ষিত বিদগ্ধ কবি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে রয়েছে রস-পিপাসার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল। এই রসপিপাসা ও বৈজ্ঞানিক-কৌতূহলের যুগপ□ মিলনে তাঁর বয়ঃসন্ধির পদগুলি চরম উ□কর্ষতা পেয়েছে। বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির রাধা কোন বৃন্দাবন থেকে আসে নি, সে রাধা কবির নিত্যদিনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাস্তব রক্ত-মাংসের মানবী; এই বাস্তব জীবন্ত মানবীর উপর কবি তাঁর মানসসুন্দরীকে আরোপ করে সৌন্দর্য-সাধনার অতি উচ্চ সোপানে আরোহণ করেছেন। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেন- “তাহার রাধিকা যেমন একদিকে বিশ্বহৃদির রাধারানি, অন্যদিকে তেমনি তাঁহার কবিপ্রাণের সৌন্দর্যলক্ষ্মী, বিদ্যাপতির সামনে অসীম সৌন্দর্যময়ী রহস্যমতি বিরাজিত ছিল। কবি বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহারই রূপসুধা পান করিয়াছেন।”

সৌন্দর্যরসিক বিদ্যাপতির রূপমুদ্ধতা কাব্য রসিক সমালোচক সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন- “কোথাও দেহে যৌবনের দুয়ারে আঘাত করিয়াছে, মনের তন্দ্রা ঘুচে নাই। আবার কোথাও দেহে অবিচল কমল-কোরকের মতই সৌরভ সুপ্ত অথচ তাহাকে ঘিরিয়া যৌবন মধুকর গুন গুন করিয়া ফিরিতেছে। কবি এ সবই দেখিতেছেন, দেখিয়া বিভোর হইয়াছেন। সে বিভোরতা আত্মবিভোরতা নয়, বস্তবিভোরতা, তাহা একান্তই তন্ময় রসসৃষ্টি। তাই শ্রীরাধিকার সৌন্দর্য সন্ধির মধ্যে পথ হারাইয়াও কবি কোথাও মন হারান নাই।”

শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধিকালের দ্বন্দ্ব বিদ্যাপতির বর্ণনায় যেমন মৌলিক, তেমনই চম□কার-

‘খনে খনে নয়ন কোণ অনুসরঈ।

খনে খনে বসনধূলি তিনু ভরঈ।।

হিরিদয় মুকুল হেরি হেরি থোর।

খনে আঁচর দএ খনে হোয় ভোর।।’

বয়ঃসন্ধির পরই শ্রীরাধার যৌবনকাল সমাগত। কৈশোরের দেহ-চাঞ্চল্যের কিছুটা নিবৃত্তির পর, মনে জাগল চাঞ্চল্য -

‘শুনইতে রসকথা থাপএ চিত।

জইসে কুরঙ্গিনী শুনয়ে সঙ্গীত।।’

শ্রীরাধার মাধুর্য যেন দেহ-মনে আলিঙ্গন করে আছে। যৌবনের সঙ্গে এখন গভীরভাবে পরিচয় হয়নি।

বয়ঃসন্ধির পদে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিদ্যাপতির তীক্ষ্নদৃষ্টি ও মনোধর্মিতা। বিদ্যাপতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভা, জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা এবং সুগভীর মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টিতে নিম্নোক্ত পদটি কতই না উ□কর্ষ !

‘কেলিক রভস যব শুনে আনে।

অনতত্র হেরি ততহি দিএ কানে।।

ইথে যদি কিউ করএ পরচারি।

কাঁদন মাখী হাসি দিএ গারি।।’

তাই নিশ্চিত করেই বলা যায়, বিদ্যাপতি শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধির শ্রেষ্ঠ কবি। বিদ্যাপতির বয়ঃসদ্ধির সেই রাধা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন- “বিদ্যাপতির রাধা নবীনা, নবস্ফুটা। আপনাকে এবং পরকে ভালো করিয়া জানে না। দূরে সহাস্য সতৃষ্ণ লীলাময়ী; নিকটে কম্পিত শঙ্কিত বিহ্বল। কেবল একবার কৌতূহলে চম্পক অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া অতি সাবধানে অপরিচিত প্রেমকে একটুমাত্র স্পর্শ করিয়া অমনি পলায়নপর হইতেছে। যেমন একটি ভীরু বালিকা স্বাভাবিক পশুস্নেহে আকৃষ্ট হইয়া অজ্ঞাতস্বভাব মৃগকে একবার সচকিতে স্পর্শ করে, একবার পালায়, ক্রমে ক্রমে ভয় ভাঙে, সেইরূপ। যৌবন, সে-ও সবে আরম্ভ হইতেছে, তখন সকলই রহস্য পরিপূর্ণ। সদ্যবিকচ হৃদয় সহসা আপনার সৌরভ আপনি অনুভব করিতেছে; আপনার সম্বন্ধে আপনি সবেমাত্র সচেতন হইয়া উঠিতেছে; তাই লজ্জার ভয়ে আনন্দে সংশয়ে আপনাকে গোপন করিবে কি প্রকাশ করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না -

কবহুঁ বান্ধয়ে কচ কবহুঁ বথিারি।

কবহুঁ ঝাঁপায়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘারি।।

হৃদয়ে নবীন বাসনা সকল পাখা মলেয়িা উড়তিে চায় কন্তিু এখনও পথ জানে নাই। কৌতূহল ও অনভজ্ঞিতায় সে একবার ঈষ□ অগ্রসর হয় আবার জড়সড় অঞ্চলটরি অন্তরালে আপনার নভৃত কোমল কুলায়রে মধ্যে ফরিয়িা আশ্রয় গ্রহণ করে।''

৩.৩। বদ্যিাপতরি পদে পূর্বরাগ

বয়ঃসন্ধকিালরে দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হয়ে বদ্যিাপতরি রাধার অন্তরে পূর্বরাগরে সৃষ্টি হয়। বদ্যিাপতরি পূর্বরাগরে পদে রাধার বয়ঃসন্ধরি চপলতা ক্রমশ মানস-পরণিীতরি মধ্য দয়িে কৃষ্ণরতরি প্রতি আকৃষ্ট হয়ছে। চন্ডীদাস বা জ্ঞানদাসরে তুলনায় বদিাপতি পূর্বরাগরে পদে কৃতত্বি অর্জন করতে না পারলওে বয়ঃসন্ধরি পরণিতি যে পূর্বরাগে, তা যথষ্টে দক্ষতার সঙ্গইে দখেয়িছেনে। এমনকি বদ্যিাপতরি পূর্বরাগরে বশেকছিু পদে বয়ঃসন্ধরি চপলতাও লক্ষ্য করা যায়-

'তঁহি পুর মোতি হার তোড়ি কবেল

কহত হার টুটি গলে।

সবজন এক এক চুনি সঞ্চয়

শ্যাম দরশ-ধনি লিলে।।'

দহেচপলতার সঙ্গে সঙ্গে রাধার মনওে এই প্রথম প্রমেরে উন্মষে ঘটছে। দহৈকি পরবির্তনে বয়ঃসন্ধকিালে রাধার মনে যে কৌতূহলরে সৃষ্টি হয়ছেলি, পূর্বরাগরে পদে সইে কৌতূহল মানস-ববির্তনরে মধ্যে দয়িে অনকে বদিগ্ধ ও পরণিত হয়ে উঠছে। বদ্যিাপতরি রাধা পূর্বরাগরে একটি পদে তাই বলনে-

'অবনত আনন ক এ হম রহলহিুঁ

বারল লোচন-চোর।

পয়িামুখরুচি পবিএ ধাওল

জনি সে চাঁদ চকোর।।'

সখিদের যত্নে ধীরে ধীরে রাধা শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টায় পূর্বরাগের নায়িকা হয়ে উঠেছেন। এই পদে মলিনভীতির মধ্যেও রাধার কামনার লজ্জা এবং সুখস্বপ্নের বিকাশ লক্ষণীয়। এই পদে রাধা লীলাকুশলী হয়ে উঠেছেন। এরকম বহুপদে বিদ্যাপতির পূর্বরাগের রাধা লীলাবিলাসিনী হয়ে উঠেছে। নানা পরিবেশে শ্রীরাধার সৌন্দর্যের অভিনব বিকাশও কবি লক্ষ্য করেছেন।

পদাবলী সাহিত্যে পূর্বরাগ বলতে মূলত শ্রীরাধার পূর্বরাগই বুঝায়। শ্রীরাধার পূর্বরাগের ভাবতন্ময় চিত্র অঙ্কনে চন্ডীদাস ও জ্ঞানদাস অতুলনীয় শ্রীরাধার পূর্বরাগের সেই উচ্চতায় বিদ্যাপতি পৌঁছতে পারেননি, এ কথা অতীব সত্য; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের চিত্র অঙ্কনে বিদ্যাপতি অন্য সকলের থেকে সফল। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মত - "বিদ্যাপতির কবি-প্রাণের স্বধর্ম, যাহা ভাব ছাড়িয়া রূপ, রস ছাড়িয়া অর্থের দিকে বেশি ঝুঁকিয়া পড়ে। শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ তো আর কিছুই নহে, তাহা রূপমুগ্ধতা। রাধিকার রূপ দেখিয়া কৃষ্ণের মন মজিয়াছে। বিমুগ্ধ প্রাণের সেই উচ্ছ্বসিত স্তবো□সার শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ-বিষয়ক পদে ঐরূপ অনুপম-সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।"

বিদ্যাপতি নিজেই যেন শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যমে সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর আরাধনা করেছেন। রূপমুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণের কামনার সেই দহনজ্বালা ধরা পড়েছে-

'অপরূপ পেখল রামা

কনকলতা অবলম্বনে উয়ল

হরিণি-হীন হিমধামা।'

কৃষ্ণের দৃষ্টি আর বিদ্যাপতির দৃষ্টির সমধর্মিতার জন্যই বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির পদ যেমন উ□কৃষ্ট, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগও উ□কৃষ্ট । যেমন শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের একটি পদে-

'যব-গোধুলি সময় বেলি।

ধনি-মন্দির বাহর ভেলি।

নব জলধর বিজুরি-রেহা

দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।।'

আরকেটি পদে-

‘গলে কামনী গজহু গামনী

বহিসি পলটি নহোরি।

চরণে যাবক হৃদয় পাবক

দহই অঙ্গ মো·র।।’

কংিবা

‘চকিুর গরএ জলধারা।

জনি মুখশশী ডর

রো·য়এ আঁধারা।’

উপমাদি অলঙ্কার ও অসাধারণ চত্রিকল্পরে মাধ্যমে বদি্যাপতি শ্রীকৃষ্ণরে পূর্বরাগরে পদগুলি অঙ্কতি করছেনে, যখোনে তনিি চন্ডীদাস ও জ্ঞানদাস থকেে স্বতন্ত্র । বদি্যাপতরি পূর্বরাগরে পদগুলি চত্রিধর্ম, নাটকীয়তা, অলঙ্কারাদরি দ্বারা সঞ্জীবতি বলইে তাঁর মতো এমন অপূর্ব উজ্জ্বল ছবি তাঁর কালে আর কউেই আঁকতে পারনেনি।

৩.৪। বদি্যাপতরি পদে অনুরাগ

যে রাগ বা প্রমে নত্যি নবায়মান হয়ে সর্বদা অনুভূত-প্রয়িজনকে নতুন নতুন করে অনুভব করায় অর্থা□ অনুভূত প্রমেকে প্রতি মুহূর্ত নবীনতা দান করে তাকে অনুরাগ বলে। শ্রীরূপ গো·স্বামী ‘উজ্জ্বলনীলমণি’ গ্রন্থে ‘আনুরাগ’-এর সংজ্ঞা দয়িছেনে -

‘সদানুভূতমপি যঃ কুর্যান্নবনবং প্রয়িম্।

রাগো· ভবন্নবনবঃ সো·হনুরাগ ইতীর্যতে।।’

এখানে প্রমে প্রতি মুহূর্তে নব নব রূপে নব নবায়মান হয়ে নব নব আনন্দানুভূততিে উপস্থতি হয়। পদাবলী সাহত্যি সব পর্যায়ইে রাধা কৃষ্ণরে প্রতি অনুরাগে আসক্ত; অর্থা□ রাধার প্রমে কৃষ্ণরতমিয়। তবে একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, পূর্বরাগ ও অনুরাগ কন্তিু এক নয়। রাধার অনুরাগ

মন্তব্য

সম্পর্কে আধুনিক সমালোচকের মন্তব- "অনুরাগের একদিকে আছে রাধার হ্লাদিনী শক্তির ক্লান্তিহীন ক্ষান্তিহীন আত্মগত উ□সার, অন্যদিকে আছে কৃষ্ণ-রহস্যের প্রতি দুনিবার আকর্ষণ। এই প্রেমের ব্যঞ্জনা 'তিলে তিলে নোতুন হোয়।' এই প্রেমের একদিকে আছে মৃত্যুকে স্বীকার করেও কৃষ্ণ-সঙ্গ-লাভের ইচ্ছা, অন্যদিকে আছে দিব্যোন্মাদ, যা চৈতন্যের শেষ জীবনে বিশেষরূপে প্রকটিত হয়েছিল।" (বৈষ্ণব পদাবলী : বসু ও বন্দ্যোপাধ্যায়)

বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত অনুরাগের এই পদটি অসাধারণ।

'সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।

সোই পিরিতি অনু রাগ বাখানিতে

তিলে তিলে নূতন হোয়।।'

পদটি অনেকে কবিবল্লভের বলেও উল্লেখ করেছেন। তবে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু পদটির আন্তররূপ ও পারিপার্শ্বিক তথ্যযোগে প্রমাণ করেছেন, পদটি বিদ্যাপতিরই রচনা।

পদটিকে অনুরাগের রসভাষ্য বলা যায়। এই প্রেমের সুগভীর ব্যঞ্জনা হল 'তিলে তিলে নূতন হোয়'। এই পদে রাধার অনুভবের উত্তাপ, স্পন্দন, নব নবায়মান প্রেমের রসবৈচিত্র্য দেশকালাতীত। রাধার অন্তর কেবল কৃষ্ণ প্রেমময় যে প্রেমে, যে আনুরাগ প্রতিমুহূর্তে নতুন হয়ে ওঠে, যা ব্যাখ্যাতীত।

৩.৫। বিদ্যাপতির পদে অভিসার

পদাবলী সাহিত্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পর্যায় হল অভিসার। নায়ক বা নায়িকার প্রিয় মিলনের উদ্দেশ্যে সঙ্কেতে স্থানে গমনকে 'অভিসার' বলে। বিদ্যাপতির অভিসারের পদের মধ্যে দিয়ে এক রোমান্টিক সৌন্দর্যলোকের পটভূমিকা তৈরি হয়েছে - যা শেষ পর্যন্ত এক অতীন্দ্রিয় রসলোকে বা আধ্যাত্মিক লোকে উত্তীর্ণ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কবিশেখর কালিদাস রায়ের মন্তব্য স্মরণযোগ্য- "পদাবলী সাহিত্যে শ্রীরাধার অভিসারই সমগ্র লীলাতত্ত্বের মেরুদণ্ড। অভিসারে গতানুগতিক গৃহশৃঙ্খল, লজ্জাকুলশীল, সংসারধর্ম, পরিজন গুরুজনের ভয় সমস্তই দূরীভূত ও পরাভূত। কন্টক, উত্তপ্ত বালুকা, সর্প, বজ্র, দারুণ, বর্ষা, গভীর শীত্য, সূচিভেদ্য

অন্ধকার ইত্যাদি সমস্ত প্রাকৃতিক বাধাবিঘ্ন উপেক্ষিত, অভিসারিকার দেহোত্মবুদ্ধি পর্যন্ত বিলুপ্ত। ইহাই প্রেমোবগেরে চূড়ান্ত। ইহা যেন লৌকিক গন্ডী উত্তরণ করিয়া আধ্যাত্মিক প্রেমের স্বরূপই প্রকাশ করিতেছে। পদাবলীর অভিসার লোকোত্তরতা লাভ করিয়াছে।"

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'কে বাংলা পদাবলী সাহিত্যের উৎসভূমি বলে মনে করা যায়-

'রতি সুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহর বেশম্।

ন কুরু নিতম্বিনী গমনবিলম্বনমনুসর ত্বং হৃদয়েশম্।।'

অভিসার পর্যায়ের পদরচনায় বিদ্যাপতি প্রথমে বয়ঃসন্ধি ও পূর্বরাগের মানস-বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ রূপ-সৌন্দর্যের জগতে অধিষ্ঠিত থাকলেও ক্রমশ হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে আধ্যাত্মিক ভাবের জগতে প্রবেশ করেছেন। অথচ এই ভাব বিদ্যাপতির স্বভাব ধর্মবিরোধী। আর এখানেই বোঝা যায়, অন্তরটি তাঁর শ্রীরাধার মতো ব্যথাতুর হৃদয়ের আর্তিতে ভরপুর -

'নিত্য পহুঁ পরহিরি সঁতরি বিথিম পরি

আঁগরি মহাকুল গারী।

তুঅ অনুরাগ মধুর মদে মাতলি

কিন্তু ন গুণল বরনারী।।'

বিদ্যাপতির অভিসারের পদে রাধার যে বিরহবেদনা লক্ষ করা যায়, সে বিরহের সঙ্গে কবি নিজেই যেন একাত্ম হয়ে গেছেন। একারণেই বিদ্যাপতির পূর্ববর্তী পদের থেকে অভিসারের পদ অনেক বেশি ভাবগাম্ভীর্য লাভ করেছে। বিদ্যাপতি রাধার অভিসার যেমন রচনা করেছেন, তেমনি দুর্লভ কৃষ্ণের অভিসারও বর্ণনা করেছেন; আবার রাধার উক্তিতে, কৃষ্ণের উক্তিতে, এমনকি সখিদের উক্তিতেও অভিসার বর্ণনা করেছেন। তবে অভিসার যাত্রার বর্ণনা, কিংবা যাত্রাপথের বাধাবিপত্তি বর্ণনায় বিদ্যাপতি যেন অনেকটাই উদাসীন। এর কারণ হয়ত চৈতন্য-পূর্বযুগের কি হওয়ায় তাঁর পক্ষে অভিসারের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য অনুভব করা সম্ভব হয় নি। তবে বেশ কিছু পদে অভিসারিকার প্রস্তুতির বেশ দেখা যায়। যেমন-

'চরণ নূপুর উপর সারী।

মুখর মেখল করে নিবারী।।

অন্বরে সামর দেহ ঝপাঈ।

চলহি তিমির পথ সমাঈ।।'

বিদ্যাপতি রচিত শ্রীমতী রাধিকার অভিসারের একটি উল্লেখযোগ্য পদ হল-

'রয়নি কাজর বম ভীম ভূজঙ্গম

কুলিশ পড়এ দুরবার।

গরজ তরজ মন রোষ বরিষি ঘন

সংশয় পড়ু অভিসার।।

সজনি বচন ছোড়িতে মোহে লাজ।

হোয়ত সো হোউ বরু সব হম অঙ্গিকরু

সাহস মন দেল আজ।।'

এই পদটি বর্ষাভিসার, নিশাভিসার, এমনকি তামসী অভিসারেরও বটে। রসশাস্ত্রের মতে, পদটিতে কোন ত্রুটি না থাকলে বয়ঃসন্ধি বা বিরহের পদে যে উৎকর্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়, এখানে তা পাওয়া যায় না। আসলে রূপ-সৌন্দর্যের জগৎ অতিক্রম করে কবি আধ্যাত্মিক জগতে পাড়ি দিয়েছেন অভিসারের কিছু কিছু পদে। রূপসৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশের প্রথমাবস্থার এই দুই জগতের দোলাচলতায় কবি মন স্থিরীকৃত না হওয়ায় অভিসারের পদগুলি হয়ত তেমন উৎকর্ষ অর্জন করতে পারেনি। তৎসত্ত্বেও বিদ্যাপতির অভিসারের পদগুলির আলাদা একটা মূল্য আছে। এটাই তাঁর মৌলিকতার দিক। শ্রীরাধার ব্যর্থ অভিসারের তেমনি একটি উল্লেখযোগ্য পদ -

'বড়ঁ মনোরথঁ সাজু অভিসার

পিসুন নয়ন বারি।

কাজ ন সীঝল তেত রহল

হমে অভাগিলি নারি।

সাজনি, হমর দিবস দোস।

গুরুঅ পূরব পাপ পরাভবি

কওনে করব রোস।।

ন ঘর রহলুঁ ন পর ভেলহুঁ

ন পুরু হৃদয়-সাধ।

আধহ পথ সসী হসি উগিল

তেঁ ভেলে গমন বাধ।।'

বিদ্যাপতি অভিসারের বিশেষ কিছু বিস্ময়কর পদ রচনা করেছেন, গোবিন্দদাস ব্যতীত এই পদের তুল্য পদ আর কেউ রচনা করতে পারেননি বলা যায়। যেমন-

'কুলবতী ধরম করম ভয় অব সব

গুরুমন্দির চলু রাখি।'

কিংবা, অধ্যাত্মব্যঞ্জনার ইঙ্গিতে সমৃদ্ধ-

'বরসি পয়োধর ধরণী বারি-ভর

রয়নি মহাভয় ভীমা।

তইও চললি ধনী তুঅ গুণ মনে গুনি

তসু সাহস জাহি সীমা।।

দেখি ভবন-ভীতি লিখিলি ভূজগপতি

জসু মনে পরম তরাসে।

সে সুবদনী করে ঝপইত ফণীমণি

বিহুসী আইলি তুঅ পাশে।।

নিঅ পহুঁ পরিহরি সঁতরি বিখম নরি

অঁগিরি মহাকুল গারী

তুঅ অনুরাগ মধুর মদে মাতলি

কছিু ন গুণল বরনারী।।'

বদি্যাপতি অভসিাররে পদ রচনায় তাঁর পূর্ববর্তী যুগরে কবি কালদিাস, অমরু এবং জয়দবেরে নকিট ঋণী। তবে তনি কবরি প্রভাব থাকলওে বদি্যাপতরি স্বকীয়তাও কম নয়।

৩.৬। বদি্যাপতরি পদে মান

'মান' পর্যায়রে শ্রষ্ঠে কবি বােধ হয় জয়দবে। ত□সত্ত্বওে বদি্যাপতওি মান পর্যায়রে পদ রচনায় অসাধারণ বচৈত্রি্যরে দাবদিার। মানরে পদ রচনায় বদি্যাপতি জয়দবেরে দ্বারা বশে প্রভাবতি।

বদি্যাপতরি রাধার বলিাপ চত্রি বড়ই করুণ। বদি্যাপতরি মাননিী রাধা পুরুষজাতি সম্পর্কে যে মনস্তাত্ত্বকি সদ্ধিান্তে পৌঁছান তা যনে আনকেটাই বাস্তব ও আধুনকি। শ্রীরাধা বলনে-

'পুরুষ ভমরসম কুসুমে কুসুমে রম

পঅেসি করএ কি পারে।'

কংিবা

'গগন মডল দুহুক ভখন একসর উগ চন্দা।

গএ চকােরী অময়ি পীবএ কুমুদনিি সানন্দা।।

মালতি কাঁইএ করতি রােস।

একল ভমর বহুত কুসুম কমন তাহরে দিােস।।

জাতকি কতেকি নবি পদুমনিি সবসম অনুরাগ।

তাহি অবসর তােরি নি বসির এহে তাের বড় ভাগ।।'

বহু বল্লভ চপলমতি পুরুষরে স্বভাবরে প্রতি কটাক্ষ করে শ্রীরাধা পুনরায় বলনে-

'পরক বদেন দুখন বুঝায়ে মুরুখ

পুরুষ নরিাপন চপলমতি।’

মাননিী রাধাকে সখগিণ বুঝয়িছেনে-

‘দবিস তলি আধ রাখবি জোৌবন

রহই দবিস সব জাব।

ভালমন্দ দুই সঙ্গ চলি জায়ব

পর উপকার সে লোভ।।’

বদি্যাপতি বহু পদে মাননিী রাধকিার অপরূপ সব চত্রি এঁকছেনে। শ্রীকৃষ্ণরে প্রতি শ্রীরাধার এমনই একটি পদ-

‘তোহারি কশে কুসুম তৃণ তাম্বুল

ধরলহুঁ রাইক আগে।

কোপে কমলমুখঈ পালাটনি হরেল

বঠেলি বমিুখ-বয়িোগে।।

তোহারি নাম শুনয়ে সব সুন্দরি

শ্রবণে মূদয়ে দুই পাণি।

তোহারি পরিতি যো নব নব মানই

সো অব না শুনয়ে বাণী।।’

পদাবলী সাহত্যিে সাধারণত শ্রীরাধার মানই বর্ণনা করা হয়ছে, শ্রীকৃষ্ণরে আচরণে ক্ষুব্ধা শ্রীরাধার মনে ঈর্ষাদি ভাবাদি থকেইে এই মানরে উ□পত্তি। বষ্ণৈব রসশাস্ত্রে মানরে আটরকম অবস্থা। তার মধ্যে ‘বাসকসজ্জকিা, উ□কন্ঠতিা, খণ্ডতা, বপ্রিলব্ধা ও কলহান্তরতিা’ নায়কিা-রূপরে মধ্য দয়িইে শ্রীরাধার মাননিী-রূপরে বচিত্রি প্রকাশ প্রতফিলতি হয়। মানরে উ□কর্ষ সম্পর্কে কবশিখের কালদিাস রায়রে মন্তব্য বশে উল্লখেযোগ্য- “এইখানইে পদাবলীর রসসৃষ্টি চরমে উঠয়িাছ। মানই প্রধানতঃ পদাবলীর মান রাখয়িাছ। কোন দশেরে সাহত্যিে অভমিানকে রসবস্তরূপে গ্রহণ করয়িা

এমন চমকার কবিতা রচিত হয় নাই। আশ্চর্যের বিষয় যে মান - ভারতীয় প্রেম কবিতার 'প্রাণ' - সেই মানের একটা উপযুক্ত প্রতিশব্দ পর্যন্ত ইংরাজি সাহিত্যে নাই। প্রণয়ের গাঢ়তার সঙ্গেই মানের সম্পর্ক। বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রণয়ের গাঢ়তা, গূঢ়তা ও গভীরতা চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিয়াছে - তাহার ফলে মান ইহাতে এতদূর পর্যন্ত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে মান প্রণয়লীলার একটা গতানুগতিক অঙ্গমাত্র। পদাবলী সাহিত্যে ইহা গতানুগতিকতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া পারমার্থিকতায় পৌঁছিয়াছে। লৌকিক প্রেমের কবিতা হিসাবেও 'মান' পদাবলীকে একটা অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্য, গৌরব ও উচ্চতর মর্যাদা দান করিয়াছে।"

আবার মান-বিরহে অনুতপ্তা কলহান্তরিতা নায়িকা শ্রীরাধার চিত্রও কবি বিদ্যাপতি অপূর্ব দক্ষতায় অঙ্কন করিয়াছেন। মানের শেষে রাধামাধবের মিলনের একটি অপরূপ বর্ণনাও দিয়াছেন কবি -

'অপরূপ রাধামাধব রঙ্গ।

দুজন মাননি মান ভেল ভঙ্গ।।

চুম্বই মাধব রাহি বয়ান।

হরেই মুখসসি সজল নয়ান।।

সখিগণ আনন্দে নিমগন ভেল।

দুহুঁ জন মন মাহা মনসিজ গেল।।

দুহুঁ জন আকুল দুহুঁ কুরু কোর।

দুহুঁ দরশনে বিদ্যাপতি ভোর।।'

জীবন রসরসিক অভিজ্ঞ কবি পদাবলীর অন্যান্য পর্যায়ে শ্রীরাধার চিত্র অঙ্কনে যে সাফল্য দেখিয়াছেন, মান পর্যায়েও তেমনি তিনি অনেক বাস্তব, অকৃত্রিম ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন।

৩.৭। বিদ্যাপতির পদে বিরহ

বৈষ্ণব পদসাহিত্যে বিরহের পদ স্বতন্ত্র মর্যাদার দাবিদার। শ্রীরাধার বিরহ যে কোন্ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে - বিশ্বসাহিত্য তার দৃষ্টান্ত প্রায়

বরিল। শ্রীচতৈন্যদবেরে আবর্িভাবরে পরইে বদ্যিাপতি বরিহরে পদকে অতি উচ্চ আসনে অধষ্ঠিতি করছেনে। রবীন্দ্রনাথ বদ্যিাপতকিে 'সুখরে কবি' আখ্যা দলিওে বরিহরে পদ রচনায় তাঁর কৃতত্বি অবস্মিরণীয়। পূর্ববতী পদ পর্যায়ে যে বদ্যিাপতকিে বাকচাতুর্যে সুপন্ডতি, মার্জতি রুচতিে মণ্ডতি, নাগরকি বলিাসে কুতূহলী দখেি, সইে বদ্যিাপতইি বরিহ পর্যায়ে তাঁর রাধাকে সুগভীর প্রমেরে তীব্র আর্ততিে ব্যাকুল বদেনাদীর্ণ রূপে অঙ্কন করনে। সমালে·াচকরে ভাষায় - "রাধার বরিহ-বদেনা বশ্বিব্যাপ্ত উচ্চকন্ঠে হাহাকারে মন্ডতি হয়ে কতগুলি কবতিার রসাস্বাদরে যে ঐশ্বর্যরে সৃষ্টি করে, তার অপূর্ব সে·ৌন্দর্য অনস্বীকার্য হলওে তাতে ইন্দয়িাতীত রহস্যবে·াধরে স্পর্শ নইে। বদ্যিাপতরি রাধার গভীর বদেনা কন্িতু অন্তররে অতলে তলয়িে যাবার নয়, হৃদয়রে পাত্র উপছে চারপাশরে জগ□-সংসার-প্রকৃতকিে প্লাবতি করার মত বপিুল। বদেনারও একটা ঐশ্বর্যরে দকি আছ,ে সখোনে সে একা নয়, বশ্বিপ্রকৃতরি বরিাট পটভূমরি সঙ্গে তার সংযে·াগ।"

ইন্দ্রয়িজ প্রমেকে অতক্রিম করে বদ্যিাপতরি বরিহরে পদ যনে এক অতীন্দ্রয়িলে·াকে পাড়ি দয়িছে।ে সমালে·াচকরে ভাষায় - "রূপ ও রসরে কবি বদ্যিাপতরি বরিহ পর্যায়রে পদগুলে·া পাঠ করলে কন্িতু আমাদরে মন রূপ আর রসরে জগতে আবদ্ধ থাকতে চায় না। বদ্যিাপতি রাধাকে বরিহরে আগুনে পুড়য়িে তার দহেসে·ৌন্দর্যকে অতরিক্িত একটা আত্মকি সে·ৌন্দর্যে মণ্ডতি করে দয়িছেনে। বদ্যিাপতি এই পর্যায়ে এক আধ্যাত্মকি জগতে উন্নীত হয়ছেনে।"

বরিহরে পদ রচনায় বদ্যিাপতরি কবত্বিশক্তি অতি উচ্চ মানরে। যমেন-

'অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব

কি করব বারদি মহে।

ঈ নব যে·ৌবন বরিহে গে·াঙায়ব

কি করব সে·া পয়িা-লহে।।

হরি হরি কে·া ইব দবৈ দুরাশা।

সন্িধু নকিটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব

কো দূর করব পিয়াসা॥'

কিংবা,

'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর

শূন্য মন্দির মোর।।'

অথবা,

'সজনি কো হ আওব মধাঈ।

বিরহ-পয়োধি পার কিএ পাওব

মঝু মনে নাহি পাতিয়াই।।

এখন তখন করি দিবস গোঙায়লুঁ

দিবস দিবস করি মাসা।

মাস মাস করি বরখি গোঙায়লুঁ

ছোড়লুঁ জীবনক আশা।।'

'মাথুর' তথা 'বিরহ' পর্যায়ের সূচনা হয় - শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধাম ত্যাগ করে মথুরা চলে যাওয়ায়। এই পর্যায়ে শ্রীরাধার প্রেমের গভীরতম বেদনার বাণী প্রকাশিত। রাধিকার সুতীব্র প্রেমময় আর্তি-

'কৈছে গোঙায়বি হরি বিনু দিন রাতিয়া।'

কৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধার বিদীর্ণ হৃদয়ের হাহাকার জীবনের শূন্যতা বিশ্বময় পড়েছে ছড়িয়ে-

'শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।

শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরী।।'

বিদ্যাপতির বিরহ কাতরতার রূপটিই শ্রীরাধার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়ে চিরন্তনতা লাভ করেছে । মাথুর পর্যায়ে এসেই যেন বিদ্যাপতির রাধিকা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। সমালোচক তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়-

"বয়ঃসন্ধি-পূর্বরাগ-মলিন-মান-অভিসার প্রভৃতি ভিতর দিয়া যে রাধিকা চরিত্র ক্রমশঃ মুকুলিত হইয়া উঠিতেছিল বিরহের চতুর্থ পর্যায়ে সেই পূর্ণ মুকুলিত রাধিকাকে দেখিলাম।" ('কবি বিদ্যাপতি', বিশ্বভারতী ১৩৫৯)।

পরিশেষে বলা যায়, বিদ্যাপতি রাধাকে বিরহের আগুনে পুড়িয়ে এক আত্মিক সৌন্দর্যে মন্ডিত করেছেন; কবি যেন এক আধ্যাত্মিক জগতের সন্ধান পেয়েছেন। ড. দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায়- "বিরহে পৌঁছিয়া কবি ভক্তি ও প্রেমের গীতি গাহিয়াছেন ..... তাঁহার ফ্রেমে বাঁধা বিলাস- কলামরী নায়িকার চিত্রপটখানা সহসা সজীব রাধিকা হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার উপমা ও কবিতার সৌন্দর্য চক্ষের জলে ভিজিয়া নব লাবণ্য ধারণ করিল। বিরহ ও বিরহান্তর মিলন-বর্ণনায় বিদ্যাপতি বৈষ্ণব কবিদিগের অগ্রগণ্য।"

৩.৮। বিদ্যাপতির পদে ভাবসম্মিলন

বৈষ্ণব পদকর্তাগণ শ্রীমতী রাধিকার বিরহজনিত আবেশকে কল্পনার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের মিলন সঙ্গসুখ-উপভোগকে 'ভাবসম্মিলন' নামে অভিহিত করেছেন। অধ্যাপক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় বলা যায়- "ভাবসম্মিলনের পদগুলিতে আবেগের নিষ্ঠা ও রসের বৈচিত্র বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কারণ এই পদসমূহে বিরহ ও মিলনের রস একসঙ্গে মিলিত হইয়াছে। কৃষ্ণের মথুরাগমনের পর রাধা ও কৃষ্ণের আর মিলন হয় নাই বটে, কিন্তু বৈষ্ণব ভক্তকবিগণ এই বিরহের হাহাকারে কেমন করিয়া সমাপ্তির রেখা টানিবেন? তাই তাঁহারা ভাবসম্মিলন বা ভাবোল্লাস নামক এক পৃথক পর্যায়ের পরিকল্পনা করিয়াছেন। ভাবলোকে, মনোজগতে কল্পনার আকাশে শ্রীরাধা কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়া মনে করিতেছেন, যেন কৃষ্ণ সত্যই দীর্ঘ বিরহের ব্যবধানের পর তাঁহাকে গ্রহণ করিতে আসিতেছে - চারদিকে তাহারই শুভ সূচনা। কিন্তু কৃষ্ণ তো মথুরা হইতে ফিরেন নাই। পদকর্তা এ নির্মমতা সহ্য করিবেন কি করিয়া ? তাই এই পর্যায়ের পদে রাধাকৃষ্ণের কাল্পনিক মিলনের চিত্র আঁকিয়া তাঁহারা লীলারসের উপসংহার করিয়াছেন।"

ভাবসম্মিলনের পদে বিদ্যাপতি তুলনা রহিত। রাধার রূপচিত্রাঙ্কনে বিদ্যাপতির স্বতঃস্ফূর্ততা অতুলনীয়। অভিসার পর্যায় থেকেই যেন তিনি রূপ থেকে রসের জগতে প্রবেশ করেছেন। বিরহ পর্যায়ের বেদনার্ত হৃদয়ের

মন্তব্য

হাহাকার ভাবসম্মিলন পর্যায়ে কল্পিত মধুর-মিলনের পরিসমাপ্তিতে অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। বিদ্যাপতি নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব ছিলেন না বলেই হয়ত তাঁর মনে রাধাকৃষ্ণের কল্পিত মিলনের ক্ষেত্রে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। ফলে বিরহের পর ভাবসম্মিলনের পদে সার্থক হয়ে উঠেছে। রাধিকার উল্লাস, আনন্দের অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে এই পদে-

'আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা।।
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা।।
সোহি কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ
মল পবন বহুঁ মন্দা।।
অব মঝু যব পিয়া সঙ্গ হোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা।।'

'ভাব ও ভাষা, রস ও রূপের এমন পার্বতী-পরমেশ্বর মিলন সত্যই বিরল।'

দূতীর সঙ্গে-শ্রীকৃষ্ণের মথুরা থেকে ব্রজধামে ফিরে আসার ভাবনায় শ্রীরাধার কতই না আনন্দ -

‘পয়িা যব আওব এ মঝু গহে।

মঙ্গল যতহুঁ করব নজি দহে।।

বদৌ করব হাম আপন অঙ্গম।

ঝঞ্জু করব তাহ চকিুর বছিান।।

আলপিনা দওেব মোতমি হার।

মঙ্গল কলস করব কুচভার।।’

এইপদ বদি্যাপতি যনে এক আধ্যাত্মকি তত্ত্বরেই সন্ধান দয়িছেনে। পরমাত্মার সঙ্গ জীবাত্মার মলিনরে আভাস শ্রীরাধার অপূর্ব ভাবোল্লাসরে প্রকাশ ঘটছে। ভাবসম্মলিনরে পর্যায়রে একটি উৎকৃষ্ট পদ হল-

‘কি কহব র সখি আনন্দ ওর।

চরিদনি মাধব মন্দরি মোর।।

পাপ সুধাকর যত দুঃখ দলে।

পয়িা-সুখ দরশন তত সুখ ভলে।।’

প্রয়িতমরে জন্য শ্রীরাধার উৎকণ্ঠার শষে নইে। একবার ভাবছনে -

‘হামক মন্দরি জব আওব কান।

দঠিি ভরি হরিেব সো চান্দ বয়ান।।

নহি নহি বোলব জল হম নারি।

অধকি পীরতি তব করব মুরারি।।’

কখনও বা ভাবছনে-

‘অঙ্গন আওব জব রসয়িা।

পালটি চলব হম ইসত হঁসয়িা।।’

সব দুঃখরে অবসান ঘটয়িে একসময় প্রয়িতম এলনে। তখন -

‘কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।

চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।।’

প্রিয়-মিলনসুখে উল্লসিত শ্রীরাধার আনন্দ বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ছে। এখন আর কোকিলের কুহুধ্বনি, চাঁদের আলোর প্রতি তাঁর রোষ নেই। আজ তাদের প্রতি শ্রীরাধার কৃপা ঝরে পড়ছে -

‘সোহি কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ

লাখ উদয় করু চন্দা।

পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ

মলয় পবন বহুঁ মন্দা।।’

তাই বলা যায়, ভাবসম্মিলনের পদে বিদ্যাপতিই শ্রেষ্ঠ। এমন ভাব-ভাষা, রূপ ও রসের যুগল মিলন আর কোথাও নেই।

৩.৯। বিদ্যাপতির প্রার্থনা বিষয়ক পদ

বিদ্যাপতির প্রার্থনাপদ বৈষ্ণব পদসম্ভারের রস-বৈচিত্রীর সঞ্চার করেছে; মূল পদাবলীর বাইরে থেকেও এই পদগুলি যেন একেবারে ভিতরের জিনিস হয়ে গেছে। ভাগবত অন্তর্গত রাধাকৃষ্ণপ্রেমোপায়ক কবি বিদ্যাপতি তাঁর দীর্ঘ ঐশ্বর্যময় জীবনের প্রান্তে এসে এখানে শ্রীকৃষ্ণকে যে আত্মনিবেদন করেছেন তা এক জীবনসফল পুরুষশ্রেষ্ঠ ও কবিশ্রেষ্ঠের মৃত্যু-চেতনা ও পরাভব-চেতনাকে বেদনা ও বৈরাগ্যের আবরণ আভরণ মণ্ডিত করে কবিতাপ্রিয়ের উপভোগের নিমিত্ত করেছে। কবি এখানে তাঁর নিজস্ব আত্মের - কবিব্যক্তিত্বের উন্মোচন করেছেন; আত্মজীবনীর মধোবী বিচ্ছুরণ এইসব পদের স্থায়ী সম্পদ- বুদ্ধি দীপ্ত বচন-বিন্যাসে ছন্দে মিলে অলঙ্কারে চিত্রকল্পে সঙ্গীতে আকারে কয়েকটি অননুকরণীয় প্রবাদতুল্য পদ কবি তাঁর গুণগ্রাহী পাঠকজনকে উপহার দিয়েছেন। এই পদগুলি শুধু কালস্রোতকে লিপিবিদ্ধ করেনি, সময়ের অপসরণকে অশ্রুসজল কারুণ্যে প্রকাশ করেনি, স্বয়ং তারা কালজয়ী, কালোত্তীর্ণ হয়েছে।

প্রথম পদের পংক্তিটি একটি সার্থক জীবন উপন্যাসের যেন প্রথম পাতা-

‘তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম

সুত মতি রমণি সমাজে।

তোহে বিসারি মন তাহে সমপরিলু

অব মঝু হব কোন কাজে।।

মাধব, হম পরিণাম নিরাসা।

তুহুঁ জাগতারণ দীন দয়াময়

অতত্র তোহারি বিশোয়াসা।।

আধ জনম হম নিন্দে গোঙায়লুঁ

জরা সিসু কতদিন গেলো।

নিধুবনে রমণি রিসরঙ্গে মাতলুঁ

তোহে ভজব কোন বেলো।।

কত চতুরানন মরি মরি জাওত

ন তুয়া আদি অবসানা।

তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত

সাগর লহর সমানা

ভনয়ে বিদ্যাপতি শেষে সমন-ভয়

তুয়া বিনা গতি নহি আরা।

আদি অনাদি নাথ মহায়সি

ভবতারণ ভার তোহারা।।'

উত্তপ্ত সমুতটবালুরাশি যেমেন যেমেন সব বৃষ্টি নিঃশেষে শুষে নেয়ে সংসারও তার পুত্র-মিত্র-রমনী সমাজ নিয়ে আমাকে তেমেন করছে। তোমাকে ভুলে আমি তাতে মন দিয়েছিলাম, আজ আমার কি উপায় হবে। হে মাধব, আমি পরিণাম সম্বন্ধ রাত গেছে; তুমি জগ□কে উদ্ধার কর, জীবনের প্রতি দয়াময়, অতএব তোমারই প্রতি বিশ্বাস-ভরসা রাখি। অর্ধেকে আমি ঘুমিয়ে কাটালাম। জরা ও শৈশব আমার অনেকে দিন নষ্ট করল, নিধুবনে রমণীর সঙ্গে মিলনের

রঙ্গরসে মেতে উঠে কালক্ষেপ করলাম, কখন তোমাকে পূজা করব। কত চতুর্মুখ জগদ্ভ্রষ্টা ব্রহ্মা মরে মরে যাচ্ছে কিন্তু তোমার আদিও নেই অন্তও নেই; সব কিছু সৃষ্টি ও সৃজনকর্তা তোমার থেকে জন্মে আবার তোমাতেই বিলীন হয় যেমন সমুদ্রের ঢেউ সমুদ্র থেকে জাত হয়ে আবার সেখানেই মিলিয়ে যায়। বিদ্যাপতি বলছেন, শেষ সময়ে মৃত্যুভয় হচ্ছে, তুমি ছাড়া আর গতি নেই। লোকে বলে তুমি আদি ও অনাদির অধীশ্বর সমস্ত সংসারকে পার করানোর ভার তোমার উপর।

বিদ্যাপতির প্রার্থনাপদে দুটি বিষয় দেখা যায়। প্রথমত তিনি এখানে ভারতবর্ষীয় ঐতিহ্য আশ্রিত শ্রীমদ্ভাগবতপ্রোক্ত চিরন্তন মাধব বা কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিজের আর্তি ও প্রার্থনা জানিয়েছেন। দ্বিতীয়ত এইসব পদে তাঁর নিজস্ব একটা মনস্তত্ত্ব কাজ করছে। আগে প্রথম প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করছি। ভাগবতে বলা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান।

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন রাধা প্রভৃতি গোপীগণ কামগায়ত্রী কামবীজে তাঁর উপাসনা করেন। নারী-পুরুষ স্থাবরজঙ্গম তিনি সকলের চিত্তআকর্ষক, সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন। শ্রীমদ্ভাগবতে এইসব কথা বলা হয়েছে। তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু, শ্রীরাধার অতিপ্রিয় কৃষ্ণরূপ চন্দ্র। তিনি শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্তিধর, সর্ব চিত্তহরণকারী। তাঁর চরণরেণুলাভ করার বাসনায় সমস্ত কামপরিত্যাগ করে নিখিল ধৃতব্রত তপস্যারত। কৃষ্ণ প্রীতি আর সমস্ত কিছুকে তাৎপর্যহীন করে তোলে। কৃষ্ণবিষয়িনী প্রীতির আবির্ভাব ও বৃদ্ধি কৃষ্ণ কৃপা ও কৃষ্ণ অভিপ্রায় থেকেই হয়ে থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই হচ্ছে ভাগবতী প্রীতির গতি। ইহকালের সুখলাভের বাসনা ও মোক্ষলাভ ইত্যাদির বাসনা এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারেনা। শ্রীমদ্ভাগবতে একটি শ্লোকে পাচ্ছি যাঁরা ভক্ত তাঁরা পরমভক্তিসহকারে তাঁর চরণকমলকে সর্বপুরুষার্থসার বলে গ্রহণ করেন এবং এভাবেই তাঁর আপনজন হন। (প্রীতিসন্দর্ভ; ষড়সন্দর্ভ, শ্রীজীবগোস্বামী)।

রাধাকৃষ্ণবিলাসলীলার পরম ঐশ্বর্যময় রূপকার বিদ্যাপতি তাঁর অনুপম পুণ্যফলেই কালজয়ী শ্রেষ্ঠ কবির প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রার্থনাপদে চিরসুন্দর মাধবের পদে আত্মসমর্পণের আকুতি তাঁকে যেন ঈশ্বরের নৈকট্যে নিয়ে গেল, যৌবনের বুদ্ধি বাদী কামতৃষ্ণিকে

প্রমেস্বরূপরে ভক্তবিাদী আপনজন করে দলি। অবশ্য এ ছলি তাঁর পরণিামরমণীয় অর্জতি অধকিার- রাধাকৃষ্ণ বষিয়ে নরিন্তর গীতরিচনাই তাঁকে কৃষ্ণভক্তরে কৃষ্ণশরণাগতরে অন্য এক উদাসীন পৃথবিীতে উত্তীর্ণ করে দলি।

আর একটি প্রার্থনা পদে বদি্যাপতি লখিছনে-

‘জতনে জতকে ধন পাপে বটোরলুঁ

মলেি পরজিনে খায়

মরণকে বরেি বরেি কোঙ্ঈ ন পূছত

করম সঙ্গ চলি জায়।

এ হরি, বন্দোঁ তুঅ পদ নায়।

তুঅ পদ পরহিরি পাপ-পয়োনধিি

পার হবো কোন উপায়।।’

কবি বলছনে- পাপরে দ্বারা যত্নে যত ধন সঞ্চয় করলাম তা পরজিনরা সবাই মলিে খয়েছে। কনি্তু এখন যখন মৃত্যু আসছে কউেই কছিু জজি্ঞাসা করে না। কর্মফল সঙ্গে চলে। হে শ্রীহরি, তোমার চরণরূপ তরণীকে বন্দনা করি; তোমার পদ পরতি্যাগ করলে আমি পাপরে সাগর কি করে পার হবো। জন্ম থকেে আজ অবধি তোমার পদসবো করনিি, যুবতী চনি্তা আমার মন অধকিার করছেলি; আমি অমৃত ত্যাগ করে হলাহল অর্থা□ বষি পান করলাম, সম্পদ আমার বপিদ হল। বদি্যাপতি বল,ে মনে ভবেে দখে শুধু কথায় কি কাজ হব,ে সন্ধ্যাবলোয় কউে কি সবো করার কাজ প্রার্থনা কর? (জীবন শুরুতে যা করা হয়নি জীবনশষেে কি তা করার সময় থাক?)

এ কবতিায় দখেি শষে জীবনওে এই দীর্ঘজীবী কবরি বাগবভৈব অটুট আছ।ে এক অদ্ভুত পাপবোধ এই কবকিে আচ্ছন্ন কর,ে তাকে ক্ষালনরে জন্য তনিি ব্যাকুল। এ কবতিার চরণে চরণে বরৈাগ্য, নর্বিদে, বষিাদ, গ্লানি, অনুতাপ ও অনুশোচনা আর্তি বসি্তার করছে।ে মনে পড়ে যায় এই কবি রাজসভার কবি, রাজা ও রানীর অনুগ্রহধন্য অনুমান করতে পারি সহেই রাজসভায় কলাবতী রমণীরা নৃত্য ও গীতে অনকে বলিাসমুহূর্ত অনুরঞ্জতি ঝংকৃত করে তুলছেলি,

মন্তব্য

বুঝতে পারি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জাঁকজমকপ্রিয় কবি যুবতীসেবিত এক উপভোগময় জীবনযাপন করেছিলেন। তাঁর মত একজন প্রকৃষ্ট কলাবিদ সৌন্দর্যবিদ নারীসৌন্দর্য সম্বন্ধে, রূপপিপাসা ও প্রেমপিপাসা সম্বন্ধে নীরব থাকতে পারেন না। তাঁর কবিতায় ছত্রে ছত্রে সৌন্দর্য ও পিপাসার জয়গান আছে। এই কবি আশি বছর বেঁচেছিলেন। আমরা ভাবি তাঁর কি এমন ভাবান্তর হল, যে তিনি চিরসুন্দর মাধবের প্রেমকেলির চিরসুন্দর ভাষ্যকার, রাধার পূর্বরাগ-বিরহ ইত্যাদির রূপায়ণের ভিতর দিয়ে নিজেরই বিলাসকলাকৌতূহল চরিতার্থ করেছিলেন- সেই তিনি কী করে এমনভাবে স্বয়ং মাধবের কাছে আত্মসমর্পণের আকুলতা ব্যক্ত করলেন। উত্তরটি সহজ। কবির চেতনায় একটি গভীরতম স্তর দেখা যাচ্ছে- মৃত্যুবেদনা, এই সুন্দর পৃথিবীকে ছেড়ে যাওয়ার পদধ্বনি শুনতে পাওয়ার ব্যথা তাঁর ভাবনাকে দার্শনিকতামন্ডিত করেছে। বিদ্যাপতির প্রার্থনাপদে সেই পরিশীলিত উচ্চ দার্শনিকতার প্রকাশই দেখি।

এই পর্যায়ের তৃতীয় পদটি বোধ হয় সবচেয়ে পরিচিত-

‘মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনি ছাড়বি মোয়।।
গণইতে দোস গুণ লেস না পাওবি
জব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মুঞি ছার।।
কিএ মানুস পসু পাখিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে গতাগতি পুনপুন
মতি রহুঁ তুয়া পরসঙ্গ।।’

মাধব তোমাকে আমি বহু মিনতি করছি। তিল তুলসী দিয়ে আমার এ দেহে তোমাকে সমর্পণ করলাম; হে নাথ, আমার প্রতি দয়া ছেড়ো না। তুমি যখন বিচার করবে, আমার দোষ গণনা করবে, লেশমাত্র গুণও পাবে না। তুমি জগ□কে বলতে শিখিয়েছ তুমি জগন্নাথ। এই তুচ্ছ আমি তো জগতের বাইরের নই। তুমি যখন জগ□কে ত্রাণ করবে, আমাকেও ত্রাণ করবে। কর্মের বিপাকে পৃথিবীতে বারবার আমার আসা-যাওয়া হবে, শুধু মানুষ নয় হয়ত পশুপাখী কীটপতঙ্গ হয়ে ফিরে আসবো কিন্তু সর্ব অবস্থাতেই যেন তোমার প্রতি আমার মন অবিচল থাকে। এই ভবসিন্ধু পার হওয়ার জন্য আজ আমি অত্যন্ত কাতর, বিদ্যাপতি বলছেন, হে দীনবন্ধু আমি তোমার পদপল্লব অবলম্বন করলাম। আমাকে ঐ পদপল্লব এক কণা দান কর মুহূর্তের জন্য।

এ পদটির ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যাপতির সব বলা শেষ হল, এখানে যেন এসে মিলিল কবির সকল দুঃখ-সুখের অবসান। এখন থেকে লেখেনী হবে বিশ্রামরত, কবি মৃত্যুমাধবের ধ্যানে মগ্ন থাকবেন, অনন্তরে পূজায় মহামৌন ও পরম নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করবেন। একটা জিনিস লক্ষণীয়, বিদ্যাপতির এই প্রার্থনা পদে শিল্প বা আর্ট ও নীতিবিদের কোন সংঘাত নেই। কবিতার রচনায় বিদ্যাপতি প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত একজন শিল্পী। প্রার্থনা পদে নিজের জন্য স্বতন্ত্র এক সান্ত্বনার দ্বীপ রচনা করছেন, নিজের চারদিকে এক রহস্যময় নির্জনতাকে গভীরতমভাবে উপভোগ করবেন বলে। খেলার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন, পৃথিবীর আসক্তিমালার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন, কিন্তু চিরপ্রিয় মাধবের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া তাঁর আর এ জীবনে ঘটল না। ঐ মাধবই তো তাঁর নায়ক, রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে কবিতায় তারই অপূর্ব প্রকাশ।

৩.১০। বিদ্যাপতির পদে শ্রীরাধা চরিত্র

রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমগীতিই বৈষ্ণব পদাবলী । বৈষ্ণব পদাবলীর মুখ্য চরিত্র শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ। রাধা চরিত্র অঙ্কনে বিদ্যাপতি যে অভিনব নৈপুণ্য ও বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা পদাবলী সাহিত্যে দুর্লভ। শ্রীরাধার রূপ অঙ্কনেই মূলত তিনি কাব্যকে রূপ-রসে সঞ্জীবিত করে তুলতে পেরেছিলেন। তবে রস-বিচারে তিনি বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীদের বদলে প্রাচীন রসবেত্তাদেরই অনুগামী ছিলেন। তাই রাধাচরিত্র নির্মাণে তিনি কোন দার্শনিক তত্ত্বকে গ্রহণ করেন নি। বিদ্যাপতির রাধা তাই সহজ হৃদয়ধর্মের অনুসারিণী মানবিক প্রেমের আদর্শ প্রতিরূপ। রূপ-রসের কবি

বিদ্যাপতি রাধার দেহজ প্রেমে উপেক্ষা করেননি। বিদ্যাপতির সেই রাধা সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- “বিদ্যাপতির রাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। সৌন্দর্য ঢলঢল করিতেছে। শ্যামের সহিত দেখা হয় এবং চারিদিকে যৌবনের কম্পন হিল্লোলিত হইয়া উঠে। খানিকটা হাসি, খানিকটা ছলনা, খানিকটা আড়চক্ষে দৃষ্টি। আপনাকে আধখানা প্রকাশ এবং আধখানা গোপন, কেবল উদ্দাম বাতাসের একটা আন্দোলনে অমনি খানিকটা উন্মেষিত হইয়া পড়ে।”

বিদ্যাপতি মূলত সম্ভোগ-রসের কবি; তাই তাঁর রাধা এত প্রাণোচ্ছল, যৌবনমদে মত্ত, রূপ-রসে আন্দোলিত। মুকুল যেমন ফুলে, ফুল যেমন ফলে পরিণত হয়, বিদ্যাপতির রাধাও তেমনি পূর্ণ প্রেমে-পরিণত হয়ে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়ে উঠেছে।

বিদ্যাপতির রাজসভার কবি। ফলে তাঁর রাধার স্বভাবে প্রকাশ পেয়েছে অভিজাত পুরশ্রীবিলাস, চারুচরণচাতুরী, সখি-মঞ্জরিত স্নানলীলা। সমালোচক বিদ্যাপতিকে সুখের কবি, বিলাসের কবি, ভোগের কবি রূপে দেখলেও তাঁর প্রেমের গভীরতা ও অন্তর্ভেদী অনুভবকে মূল্য দিয়েছেন। বিদ্যাপতির রাধা মুখ্যত নাগরিক নায়িকা। বাকপটুত্ব তাঁর সহজাত ধর্ম। যৌবন উদ্গমে কিশোরী রাধার অঙ্গধর্মে ঘটে অদ্ভুত পরিবর্তন, চপল চোখে আশে চঞ্চলত, হৃদয়ে ফুটে ওঠে নব নব বাসনার ফুল। বিরহিনী রাধিকা চরম দেহসম্ভোগ-প্রবৃত্তিতে বলে ওঠেন-

‘এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া-লেহে।’

এ রাধা চন্ডীদাসের যোগিনী রাধা নন। সমালোচকের ভাষায়- “বিদ্যাপতির রাধা কৃষ্ণকে অবিরত দেখার লোভে সখিদের সঙ্গে ছলনা করে, মুক্তহার ছিন্ন করে ছড়িয়ে পড়া মুক্তগুলি সংগ্রহে সখিদের বাধ্য করে, সেই অবসরে ‘শ্যাম-দরশ ধনি লেলে’। কখনও স্নানোত্তীর্ণা রাধা কৃষ্ণের মুখোমুখি : ‘অবনত আনন কএ হাম রহলিহু বারল লোচনচোর’ । এমন কি দেহস্বেদে রাধার অঙ্গবসন বিপর্যস্ত – ‘চুনি চুনি ভ এ কাঁচুলি ফাটলি বাহুক বলআ ভাঁগ’। কৃষ্ণরূপের ঝোড়োবাতাসে রাধা-অঙ্গের শস্যক্ষেত্রে এমন ঢেউ-

খলোনোর ছবি আর কে আঁকতে পেরেছেনে?” (বৈষ্ণব পদাবলী : অধ্যাপক বসু ও বন্দ্যোপাধ্যায়)

বিদ্যাপতির রাধা বয়ঃসন্ধি, পূর্বরাগ, মিলন, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, বিরহ, মাথুর, ভাবসম্মিলনের মধ্য দিয়ে ক্রমশ পূর্ণ থেকে পূর্ণতম হয়ে উঠছে। রূপের ডালি নিয়ে যে রাধা যৌবন উদ্যান সাজিয়েছেনে, বিরহ-ভাবসম্মিলনে সে রাধাই আবার প্রেমের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করছে। সৌন্দর্য-সাধক বিদ্যাপতির রাধার মধ্যে যুগপ□ বাস্তব ও বাস্তবাতীতের মিশ্রণ ঘটছে। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর ভাষায় - “বিদ্যাপতি তাঁর কাব্যের এক স্তরে লৌকিক অর্থে সৌন্দর্য-সাধনা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাই করিয়াছেন। না, কোনো ভক্ত-প্রাণের আকূতি নিবারণ করিতে শ্রীরাধিকার রূপ-নির্মাণ নয়, আত্মপ্রাণের সৌন্দর্য-পিপাসা চরিতার্থের জন্যই বিদ্যাপতি রাধামূর্তি তিলে তিলে রচিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার রাধিকা যেমন একদিকে বিশ্বহৃদির রাধারানী, অন্যদিকে তেমনি তাঁহার কবিপ্রাণের সৌন্দর্যলক্ষ্মী।”

বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির, পূর্বরাগের রাধা বাস্তব; কিন্তু অভিসারের রাধা বাস্তবাতীত। আবার বিরহের মধ্য দিয়ে ভাবসম্মিলনে রাধিকার যে রূপ-পরিবর্তন, সেখানে বিদ্যাপতির নিছক সৌন্দর্য-সাধনার অধ্যায় শেষ হয়েছে; সেখানে রাধার অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনাই মুখ্য হয়ে উঠছে। এই রাধা প্রেমের কৃচ্ছ্রসাধনায় অতন্দ্র প্রহরী-

‘এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর

শূন্য মন্দির মোর।।

....

তিমির দিভরি ঘোর যামিনী

অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।

বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি

হরি বিনে দিন রাতিয়া।।’

এইভাবে বিদ্যাপতির রাধার নাগরিক প্রেম আধ্যাত্মিক প্রেমে উপনীত হয়। অবশ্য এই আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে অলৌকিকত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে ড. বিমানবিহারী মজুমদারের মতে - "বিদ্যাপতির পদসমূহ তুলনামূলক রূপে বিশ্লেষণ করিলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, কবি প্রথম জীবনে কৃত নায়ক-নায়িকা লইয়া শৃঙ্গার রসের কবিতা লিখিলেও পরিণত বয়সে বৈষ্ণবীয় সাধনার রসে নিমগ্ন হয়ে রচনা করার অর্থ অলৌকিক রাধাকে সৃষ্টি করা।"

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর সঙ্গে আবার ড. মজুমদারের এই মত মেলে না। অধ্যাপক বসুর মতে- "বিদ্যাপতির আধ্যাত্মিক প্রেম নাগরিক প্রেমেরই রূপান্তর ।.....ইন্দ্রিয়জ প্রেমেরই সমুন্নত রূপ ।" তবে একথা সত্য। বিদ্যাপতির চতুরা যৌবনমত্তা নাগরিক রাধা ক্রমেই গভীর প্রেমে অতীন্দ্রিয় লোকে অবগাহন করে মহীয়সী হয়ে উঠছে। বিদ্যাপতির মানসিকতার পরিবর্তনের ফলে তাঁর রাধারও এই পরিবর্তন।

৩.১১। বিদ্যাপতির পদে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র

বিদ্যাপতি তাঁর পদাবলী সাহিত্যে যে কৃষ্ণচরিত্র অঙ্কন করেছেন তা অভিনব, অনাস্বাদিতপূর্ব। বৈষ্ণব আচার্য শ্রীঅদ্বৈত ঠাকুর স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেবকে অভ্যর্থনা করার সময় বিদ্যাপতির পদাবলী থেকে স্মরণ করে বলেন-

'কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।

চিরদিনি মাধব মন্দিরে মোর।।'

বিদাপতি তাঁর পদাবলীর প্রায় সর্বত্রই কৃষ্ণকে 'মাধব' বলেই সম্বোধন করেছেন। বিদ্যাপতির পদাবলী রচনার প্রথম ভাগে সে মাধব বা কৃষ্ণ, লৌকিক প্রেমকাহিনীর নায়ক; প্রাকৃত মানব, দেহগত শৃঙ্গারচেতনাই তঁর মুখ্য বিষয়। বিদ্যাপতির সে কৃষ্ণ ভগবান কৃষ্ণ নয়; রাজসভার রূপরসিক ও সৌন্দর্যসম্ভোগপ্রিয় প্রেমিক কৃষ্ণ। রাধার শ্রীঅঙ্গ দেখার জন্য সে কৃষ্ণ সদা উন্মুখ। এই কৃষ্ণচরিত্রের মধ্য দিয়েই রাজসভার কবি বিদ্যাপতি অভিজাত রাজপুরুষদের দেহগত প্রেমচেতনাকে পরিস্ফুট করেছেন।

'পহিলি বদরি কুচ পুন নবরঙ্গ।

দিন দিন বাঢ়য়ে পড়িএ অনঙ্গ।।

সে পুন ভএ গেল বীজক পোর।

অব কুচ বাঢ়ল সিরিফল জোর।।

মাধব পেখল রমনি সন্ধান।

ঘাটহি ভেটল করত সিনান।।

তনুসুখ বসন হিরদয় লাগি।

জে পুরুখ দেখব তেকর ভাগি।।

উর হিল্লোলিত চাঁচর কেস।

চামর ঝাঁপল কনক-মহ্যষ।।’

শ্রীরাধিকার রূপদর্শনে প্রেমভিভূত কৃষ্ণ বলে ওঠেন-

‘জঁহা জঁহা ঝলকত অঙ্গ।

তঁহি তঁহি বিজুরি তরঙ্গ।।

জঁহা জঁহা নয়ন বিকাস।

ততহিঁ কমল পরকাস।।

জঁহা জঁহা হাস সঞ্চার।

তঁহি তঁহি অমিয় বিথার।।’

বিদ্যাপতি তাঁর পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণকে পরমপুরুষ বলে বর্ণনা করলেও কৃষ্ণচরিত্রের উপর তিনি কোনো আধ্যাত্মিকতা আরোপ করেননি। শ্রীকৃষ্ণককে তিনি লৌকিক প্রেমের নায়ক রূপেই বর্ণনা করেছেন। পূর্বরাগের পদ রচনা করে পদাবলী সাহিত্যে অভিনবত্ব দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেছেন- ‘‘বিদ্যাপতির কবি-প্রাণের স্বধর্ম , যাহা ভাব ছাড়িয়া রূপ, রস ছাড়িয়া আর্থের দিকে বেশি ঝুঁকিরা পড়ে। শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ তো আর কিছুই নহে, তাহা রূপমুগ্ধতা। রাধিকার রূপ

দেখিয়া কৃষ্ণের মন মজিয়াছে। বিমুগ্ধ প্রানের সেই উচ্ছ্বসিত স্তবো□সার শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ-বিষয়ক পদে এরূপ অনুপম-সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।”

যেন কৃষ্ণ নয়, স্বয়ং কবিই তাঁর আরাধ্য সৌন্দর্য-মূর্তির বন্দনা গান রচনা করেছেন। এই, কারণে বিদ্যাপতির রাধার পূর্বরাগের তুলনায় শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের পদ উ□কৃষ্ট। পথে যেতে যেতে একবার নয়নের কোণে রাধিকার সে রূপ ‘হৃদয়ে শেল দেই গেলো।‘ রূপ-শেলবিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের কামনার সেই হৃদয়-মন্থন-জ্বালা বিদ্যাপতি অপরূপ ভাষায় বর্ণনা করেছেন-

‘যব-গোধুলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি।
নব জলধর বিজুরি রেহো
দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।।’

বিদ্যাপতি রচিত কৃষ্ণের পূর্বরাগের আর একটি পদ অপূর্ব সৌন্দর্য-চেতনায় ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে-

‘যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরঈ।
তহিঁ তহিঁ সরোরুহ ভরঈ।।’

আসলে বিদ্যাপতির নিজস্ব জীবনাদর্শন অর্থা□ সৌন্দর্য-দর্শনই যেন কৃষ্ণচরিত্রের মধ্য দিয়েই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। যেখানে তিনি বলছেন-

‘জীবন চাহি জৌবন বড় রঙ্গ।
তবে জৌবন জব সুপুরুখ সঙ্গ।।
সুপুরুখ প্রেমে কবহুঁ নহি ছাড়।
দিনে দিনে চন্দ্রকলাসম বাঢ়।।
তুহুঁ জৈসে রসবতি কানু রসকন্দ।
বড় পুনে রসবতি মিলে রসবন্ত।।
তুহুঁ জদি কহসি করিঅ অনুসঙ্গ।

চৌরি পিরীতি হিএ লাখ গুণরঙ্গ।।'

বিদ্যাপতির 'প্রার্থনা'র পদগুলিতে কৃষ্ণ চরিত্রে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। এ কৃষ্ণ পরম পুরুষোত্তম, এ কৃষ্ণ সর্বশক্তিসম্পন্ন ষড়ৈশ্বর্যময় ভগবান, মুক্তিদাতা, উদ্ধারকর্তা, পাপবিনাশক - কবি যাঁর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করে শান্তি পান, যাঁর কাছে নিজের সকল কর্মের কথা অকপটে স্বীকার করে ক্ষমাভিক্ষা চান। এই কৃষ্ণ ব্রহ্মা-মহেশ্বরেরও আরাধ্য; এই কৃষ্ণ 'আনাদিরাদিগোবিন্দ সর্বকারণকারণম্'। বিদ্যাপতি 'প্রার্থনা'র পদে যে কৃষ্ণ বা মাধবের কথা বলেছেন- ইনিই 'বিষ্ণু', 'নারায়ণ' বা 'হরি'।

৩.১২। অনুশীলনী

১। পদাবলী কাব্য বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাষ্য হয়ে ওঠায় বিদ্যাপতির অবদান কতখানি, সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। বিদ্যাপতির রাধা চরিত্র সম্পর্কে সমালোচকদের ভিন্ন ভিন্ন মতগুলি পোষণ করুন।

৩। বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধি-র পদগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪। বিদ্যাপতির পূর্বরাগ-এর পদগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৫। বিদ্যাপতির অনুরাগ-এর পদগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৬। বিদ্যাপতির অভিসার-এর পদগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৭। বিদ্যাপতির 'মান' পর্যায়ের পদগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৮। 'বিরহ' পর্যায়ের পদ রচনায় বিদ্যাপতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৯। 'ভাবসম্মিলন' পর্যায়ের পদরচনায় বিদ্যাপতি অতুলনীয় - এই উক্তির যাথার্থ্য আলোচনা করুন।

১০। 'প্রার্থনা পর্যায়ের পদরচনায় বিদ্যাপতি অভিনব' - এই উক্তির যাথার্থতা আলোচনা করুন।

১১। একটি পদ অবলম্বনে বিদ্যাপতির মাথুরের স্বরূপ আলোচনা করুন।

১২। বিদ্যাপতির পদাবলীর লৌকিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

মন্তব্য

১৩। ‘মাধব হাম পরিণাম নিরাশা’ - কবির এই নৈরাশ্যের কারণ বিশ্লেষণ করুন।

১৪। মাথুরের শ্রেষ্ঠ কবি কে? মাথুর পর্যায়ের পদগুলির কাব্যসৌন্দর্য ব্যাখ্যা করে পদকর্তার কৃতিত্ব বিচার করুন।

১৫। বিদ্যাপতির পদাবলীর বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

১৬। বিদ্যাপতির কাব্যপ্রতিভা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

১৭। বিদ্যাপতির পদে রাধাচরিত্র কিভাবে পরিস্ফুট হয়েছে আলোচনা করুন।

১৮। বিদ্যাপতির পদে কৃষ্ণচরিত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

১৯। বৈষ্ণব পদাবলীর ভিত নির্মাণে বিদ্যাপতির অবদান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২০। চৈতন্যোত্তর পদাবলীর সঙ্গে বিদ্যাপতির পদাবলীর স্বাধর্ম্য ও স্বাতন্ত্র্য আলোচনা করুন।

৩.১৩। গ্রন্থপঞ্জি

১। বিদ্যাপতির পদাবলী- খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত

২। পাঁচশত বৈষ্ণব পদাবলী- বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত

৩। ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য- বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত

৪। বৈষ্ণব পদাবলী- খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও সুকুমার সেন সম্পাদিত

৫। বৈষ্ণব পদাবলী- (সাহিত্য সংসদ) হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

৬। বৈষ্ণব পদ সংকলন- দেবেনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

৭। বৈষ্ণব পদাবলী- সুকুমার সেন সম্পাদিত

৮। বৈষ্ণব পদাবলীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ- পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

৯। চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি- শঙ্করীপ্রসাদ বসু

১০। বাংলা সাহত্যিরে ইতবিৃত্ত- (প্রথম খণ্ড) অসতিকুমার বন্দ্যে·াপাধ্যায়

একক: ৪ : বিদ্যাপতির পদাবলীর বিভিন্ন দিক বিচার

বিন্যাসক্রম

৪.১। বিদ্যাপতির পদসজ্জা ও গঠনরীতি

৪.২। বিদ্যাপতির পদের ভাষা

৪.৩। বিদ্যাপতির পদের ছন্দ

৪.৪। বিদ্যাপতির পদের অলংকার

৪.৫। বিদ্যাপতির পদে সংগীত

৪.৬। অনুশীলনী

৪.৭। গ্রন্থপঞ্জি

৪.১। বিদ্যাপতির পদসজ্জা ও গঠনরীতি

বিদ্যাপতির পদে রূপ ও রস উভয়েরই প্রাধান্য। তবে তাঁর প্রথম পর্যায়ের কাব্যে রূপের প্রাধান্য। এই রূপের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাঁর কাব্যের গঠনরীতিতে একটা সচেতন রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্যাপতির পদে বক্রোক্তি বা চাতুর্য তাঁর যে কোন পর্যায়ের পদকে সচেতনতা দান করেছে। সে সচেতনতা বহুলাংশে প্রকৃতি-সচেতনতাও বলা যায়। বিশেষ করে প্রবচন বা প্রৌঢ়োক্তির অজস্র ব্যবহারে তা রীতিমতো সমাজসচেতন হয়ে উঠেছে। অপূর্ব পদসজ্জার গুণে তা অসাধারণ হয়ে উঠেছে। যেমন-

‘যে প্রতিপালক সে ভলে পাবক’

(যে প্রতিপালক সেই পাবক অর্থাৎ যে রক্ষক সেই ভক্ষক।)

কিংবা,

‘বানর গলে কাঁহা মোতিম মাল।

সুজনক পরিতি কাঞ্চন সমান।।’

(বানরের গলায় কি মোতির মালা শোভা পায়? .....সুজনের প্রেমে কাঞ্চন সমান)

এরকম অজস্র উদাহরণে বিদ্যাপতির পদ সজ্জা ও গঠনরীতির উৎকর্ষে অসামান্য হয়ে উঠছে। তবে সবক্ষেত্রে কবির চাতুর্যের পরিচয়ে কাব্য যে উৎকৃষ্ট হয়েছে তা বলা যায় না।

কাব্য হল ভাবের রূপ-নির্মাণ। 'বাঙনির্মিতি'র দ্বারাই রূপ ও রসের যুগপৎ মিলনে কাব্য রসোত্তীর্ণ হয়। বিদ্যাপতি শব্দ ও অর্থের চমৎকারিত্বে তাঁর পদকে এমন সুসজ্জিত করেছেন, তাঁর কাব্যদেহে এমন নিটোল গঠনরীতিতে অটুট যে পাঠকের দৃষ্টি যেমন সেখানে আটকে যায়, তেমনি তাঁর চিত্তও রসলোভী হয়ে ওঠে। মূলতঃ তাঁর সৌন্দর্যরসরসিকতা পদসজ্জার গুণে ও গঠনরীতির চাতুর্যেই প্রকটিত হয়ে উঠছে। যেমন - শৈশব-যৌবনের দ্বন্দ্বে দ্বিধান্বিত এই পদটি কেমন উৎকৃষ্ট কাব্যগুণে উন্নীত-

'খনে খনে নয়ন কোণে অনুসরঈ।

খনে খনে বসনধূলি তনু ভরঈ।।

খনে খনে দশন-ছটা ছুট হাস।

খনে খনে অধর আগে করু বাস।।'

তবে বিদ্যাপতির কাব্য কেবল রীতি সর্বস্ব নয়, তাকে অতিক্রম করে তাঁর 'কবি-ব্যক্তিত্ব'ও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বের ছটায়, মননঋদ্ধ জ্ঞানালোকে তাঁর পদাবলীর সজ্জাও গঠনরীতি এক অনন্য মাত্রা পেয়েছে; এক অধ্যাত্মব্যঞ্জনার ইঙ্গিতে মুখরিত হয়ে উঠছে। যেমন, বিদ্যাপতির অভিসারের একটি পদে -

'বরসি পয়োধর ধরণী বারি-ভর

রয়নী মহাভয় ভীমা।

তইও চললি ধনী তু অ গুণ মনে গুণি

তসু সাহস নাঁহি সীমা।।

দেখি ভবন-ভীতি লখিলি ভূজগপতি

জসু মনে পরম তরাসে।'

কিংবা, অপূর্ব পদসজ্জা ও গঠনরীতরি উ□কর্ষ উজ্জ্বল এই পদটরি উল্লখে করা যায়, সখোনে ঘটছে সর্বশ্রষ্ঠে অনুভূতরি প্রকাশ -

'সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।

সোহ পিরীতি অনুরাগ বাখানতি

তলি তলি নূতন হোয়।।

জনম অবধি হাম রূপ নহোরল

নয়ন না তরিপতি ভলে।

সোহ মিধুর বোল শ্রবণহি শুনল

শ্রুতপিথে পরশ না গলে।।

কত মধুযামিনী রভসে গমায়ল

না বুঝনু কছৈন কলে।

লাখ লাখ যুগ হয়িে হয়িে রাখল

তঔে হয়িা জুড়ন ন গলে।।

কত বদিগধ জন রস অনুগমন

আনুভব কাহু না পখে।

বদি্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে

লাখে না মলিল এক।।'

বদি্যাপতরি পদাবলীর প্রায় সকল পদরে শষেইে 'ভণতিা' দখেতে পাওয়া যায়। পদরে শষে দুই ছত্ররে মধ্যে কবরি নাম যুক্ত থাকাকে 'ভণতিা' বল। বদি্যাপতরি পদাবলীতে তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা ও রানরি অথবা অন্য কোন সুহৃদরে নাম পাওয়া যায়। চতি্রকল্প-অলংকরণে বা ভাব-ভাষা-ছন্দ-অলংকারে তাঁর পদাবলী বশিষ্টি মর্যাদার দাবদিার ।

বিদ্যাপতির পদ বিভিন্ন রাগ-রাগিনীসহ গাওয়া হত। পয়ারাঙ্গরে দ্বিপদী ও ত্রিপদীর ঢঙেই বিদ্যাপতির পদাবলীগুলি রচিত - যা কাব্য রসে পরিপূরিত। বিদ্যাপতি কখনও কবিশেখর, কখনও কবিকন্ঠহার, কখনও কবিবল্লভ নামে নিজের ভণিতা দিয়েছেন; অন্য কবিও যে এসব ভণিতা ব্যবহার করেন নি তা নয়। ফলে কোন্ পদটি বিদ্যাপতির, কোন্ পদটি অন্য কবির - তা নিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

৪.২। বিদ্যাপতির পদের ভাষা

বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা বিচিত্র। সংস্কৃত, ব্রজবুলি, সংস্কৃত মিশ্র-বাংলা, সংস্কৃত মিশ্র ব্রজবুলি, বাংলা, ব্রজবুলিমিশ্র বাংলা, মৈথিলি - প্রভৃতি ভাষার বিচিত্র সমারোহে বৈষ্ণব পদাবলীর আঙিনা সুসজ্জিত।

বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষা মৈথিল প্রভাবিত ব্রজবুলি। মৈথিলির ভিত্তিতে গঠিত এক 'অপ্রাকৃত' মধুর সাহিত্যিক ভাষার নাম 'ব্রজবুলি', যাতে মৈথিলি, বাংলা, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার মিশ্রণ ঘটেছে। বিদ্যাপতি যদিও বাংলা ভাষা বলতে পারতেন, তথাপি বাংলা ভাষায় তিনি পদাবলী রচনা করেননি। মিথিলার কবি উমাপতিকে ব্রজবুলির প্রাচীনতম কবি বললেও বিদ্যাপতিকেই ব্রজবুলির শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদায় ভূষিত করা হয়।

বিদ্যাপতির পদাবলীতে ঐছন, পেখলুঁ, ভলে, কহত, যাওত, রহু, গোঙায়লুঁ প্রভৃতি শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এই সমস্ত শব্দ ব্যবহারের ফলে পদাবলীর মাধুর্য সকলের পক্ষে আস্বাদনযোগ্য হয়ে ওঠে। বিদ্যাপতি ব্যবহৃত বহু মৈথিলি শব্দই পরিবর্তিত বা প্রভাবিত হয়েই 'ব্রজবুলি' রূপে পরবর্তীকালের কবিগণের পদাবলীর রূপদান করেছে।

বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষায় একটা সুশৃঙ্খল বৈয়াকরণ-রীতি অনুসৃত হয়েছে। এই 'ব্রজবুলি' ভাষার শব্দভান্ডারে তৎসম শব্দের প্রাধান্য থাকলেও তদ্ভব এবং অর্ধতৎসম শব্দেরও প্রচুর দৃষ্টান্ত মেলে। এমনকি অল্প পরিমাণে দেশি এবং সামান্য বিদেশি শব্দের ব্যবহারও এখানে লক্ষ্য করা যায়। এই ভাষায় হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ এবং পদান্তে স্বরধ্বনির দীর্ঘ বা প্রলম্বিত উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায়; তবে কিছু কিছু ব্যতিক্রমও আছে। অধ্যাপক শ্রীপরশেচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর 'বৈষ্ণব পদসংকলন' গ্রন্থে স্পষ্ট ব্যাখ্যার মাধ্যমে জানিয়েছেন- 'ষ' স্থলে 'খ' উচ্চারণ, স্বরমধ্যগত

মহাপ্রাণধবনরি পরবির্তে ‘হ’ উচ্চারণ বশে সুলভ। শব্দরূপরে দকি থকেে মোটামুটি ভাবে মধ্যযুগরে বাংলা ভাষার সঙ্গে যথষ্টে সাদৃশ্য থাকলওে মাঝে মাঝে কছিু স্বাতন্ত্র্যও পরলিক্ষতি হয়। যমেন- অপাদান কারকে ‘তে’, ‘হি’ বভিক্তি, সম্বন্ধে 'ক' বভিক্তি প্রভৃতি। ক্রয়িারূপে দখো যায়, ব্রজবুলতিে দ্ববিধি বর্তমান (মৌলকি ও শত্ররর্থ), নষ্ঠিান্ত অতীত, কৃ□ত্যুক্ত ভবষ্যি□ এবং দ্ববিধি অনুজ্ঞা (বর্তমান ও ভবষ্যি□) প্রচলতি ছলি। বাংলার মতই অতীত কালরে বভিক্তি ‘ল’ এবং ভবষ্যি□কালরে ‘ব’ বশিষেভাবে লক্ষণীয়। এ ছাড়া অসমাপকিা ক্রয়িাতওে বাংলার মতই ‘ই’, ‘ইয়া’, 'ইতে’ প্রভৃতি বভিক্তরি প্রচলন ছলি। নামধাতুর ব্যবহারও যথষ্টেই পাওয়া যায়।”

ব্রজবুলরি ভাষা-বচিার সংক্রান্ত বস্তিৃত আলোচনা করছেনে অধ্যাপক নীলরতন সনে তাঁর ‘বষ্ণৈব পদাবলী পরচিয় : নবপর্যায়’ গ্রন্থে।

বদ্যিপতরি পদাবলীর ভাষাবচিারে ধ্বনতিত্ত্ব এবং রূপতত্ত্ব উল্লখেযোগ্য । তাছাড়া বাকবন্যিাসরীতি এবং শব্দ-উপকরণও বশিষে লক্ষণীয়। তবে কাব্য ভাষায় বাকবন্যিাসরীতি বা Syntax আলোচনার উপযোগতিা কম। আর শব্দ উপকরণরে ক্ষত্রেে বদ্যিাপতরি পদে ত□সম শব্দরে তুলনায় তদ্ভব শব্দরে ব্যবহার বশেি দখো যায়। ব্রজবুলি ভাষার শ্রুতসিৌকর্য কভিাবে পাঠককে মন্ত্রমুদ্ধরে মত আকর্ষণ করে বদ্যিাপতরি বহু পদইে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যমেন -

‘শূন ভলে মন্দরি শূন ভলে নগরী।

শূন ভলে দশদশি শূন ভলে সগরি।।’

৪.৩। বদ্যিাপতরি পদরে ছন্দ

বদ্যিাপতরি পদাবলী মথৈলি প্রভাবতি ব্রজবুলি ভাষায় রচতি। ব্রজবুলরি ছন্দ মথৈলি পদাবলীর ছন্দরে অনুসরণ । মথিলিার কবি উমাপতি কংিবা বদ্যিাপতরি ছন্দ অপভ্রংশ থকেে আগত।

ব্রজবুলরি ছন্দ বুঝবার সুবধিার জন্য 'চা’ল’ - এর উল্লখে করা হয়। যে ন্যুনতম মাত্রাসংখ্যা ছন্দ-বশিষেরে স্বরূপটি চনিতে সাহায্য করে তাকে

‘চা’ল’ বলে। এই ‘চা’ল’ সাধারণত চারটি; অর্থা□ তিনমাত্রার, চারমাত্রার, পাঁচমাত্রার ও সাতমাত্রার।

বিদ্যাপতির পদে তিনমাত্রার চা’লের ছন্দ নেই। কিন্তু পরবর্তীকালে বৈষ্ণব কবিগণ ব্রজবুলিতে তিন মাত্রার চা'লের ছন্দ সৃষ্টি করে সার্থকতা দান করেছেন।

বৈষ্ণব পদাবলীর অন্যতম ছন্দ-নিদর্শন হল - সংস্কৃত লঘু-গুরু আংশিক উচ্চারণ প্রভাবিত দিগক্ষরা, একাবলী, পঙঝটিকা, পয়ারাঙ্গের দ্বিপদী, ত্রিপদী প্রভৃতি পদবন্ধ। উচ্চারণ প্রকৃতির দিক থেকে বৈষ্ণবপদাবলীতে প্রধানরীতি হল লঘু-গুরু উচ্চারণ প্রভাবিত মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্ত ছন্দ। এখানে রুদ্ধদল দ্বিমাত্রিক এবং সময়বিশেষে আ, ঈ, ঊ, এ,ও - সংস্কৃত গুরু স্বরধ্বনির উচ্চারণও দ্বিমাত্রিক। বিদ্যাপতির অধিকাংশ পদে প্রাচীন লঘু-গুরু উচ্চারণ প্রভাবিত মাত্রাবৃত্ত প্রকৃতির নিদর্শনের দৃষ্টান্ত মেলে। তিনি পঙ্ঝটিকা (৪। ৪। ৪। ৪) বা ত্রিপদী (৮।। ৮।। ১১) বেশি ব্যবহার করেছেন। সাতমাত্রার, ছয়মাত্রার যতিভাগের ছন্দও বিদ্যাপতি রচনা করেছেন। যেমন-

পঙ্ঝটিকা :

অব মথু। রা পু র। মা ধ ব। গে লা।।

গো কু ল। মা নি কি। কো হ রি। নে লে ।।

(পূর্ণযতি বুঝাতে পংভনিষে ‘। ’ চিহ্ন ব্যবহার করা হল।)

ত্রিপদী :

মৃগমদ তিলক ।। অগর অনুলেপিত ।।

সামর বসন সমারি।

হেরেহ পছমি দিসি।। কখন হোয়ত নিসি।।

গুরুজন নয়ন নিহারি।।

এই পদের প্রথম পংক্তিটিকে ৭।। ৯।। ১১ মাত্রার পদভাগ রয়েছে।

বিদ্যাপতির সাতমাত্রার চা’লের ছন্দের উদাহরণ-

১ ১১ ১২১ ১১১ ২১১ ২

এ সখি হামারি / দুখের নাহিক / ওর।

১ ১১ ২১১ ২১২১১ ২১ ২১১ ২

এ ভরা বাদর / মাহ ভাদর / শূন্য মন্দির / মোর ।

এখানে অধিকাংশ পর্বে ৩+4 মাত্রা ভাগে শব্দবিন্যাস করা হয়েছে, ফলে ধ্বনি তরঙ্গের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। একপদী পংক্তির সঙ্গে দ্বিপদী, ত্রিপদী পংক্তির ব্যবহার বিদ্যাপতির বহুপদে লক্ষ্য করা যায়; এই পদটি তার অন্যতম উদাহরণ।

বিদ্যাপতি এবং চন্ডীদাস চৈতন্যপূর্ব দুই শ্রেষ্ঠ কবিই যথাক্রমে মাত্রাবৃত্ত এবং অক্ষরবৃত্তের প্রধান দুটি ধারা পদাবলী সাহিত্যে প্রচলন করেছেন। বিদ্যাপতির পদাবলীতে স্বরবৃত্তের একটি প্রাচীনরূপ পাওয়া গেলেও এর প্রকৃত বা দেশজ রূপটি সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে কবি লোচনদাস প্রবর্তন করেছেন। তবে বিদ্যাপতি তাঁর পদাবলীতে মাত্রাবৃত্তের যতিবিভাগ এবং ছন্দোবদ্ধের আদর্শ সম্ভবত কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকেই পেয়েছিলেন। অবশ্য উচ্চারণে তিনি কিন্তু পরিবর্তন এনেছিলেন। বিদ্যাপতি জয়দেবের আদর্শে সমমাত্রার যতিভাগ এবং যতি সূচনায় গুরুদল বিন্যাসে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে তিনি গুরু মুক্তদলকে, দেশজ ভাষায় লঘু উচ্চারণের প্রভাবে কোথাও কোথাও লঘু হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

জয়দেবের আদর্শে চতুর্মাত্রা যতিবিভাগে ১৬ মাত্রার পাদাকুলক জাতীয় ছন্দোবন্ধে বিদ্যাপতি লিখিলেন-

চির চ / ন্দন উরে / হা র ন / দে লা।

সো অব / নদী গিরি / আঁতর / ভেলা।।

পিয়াক গ / রবে হাম / কাহুক ন / গনলা ।

সো পিয়া / বিনা মোহে / কে কি না / কহলা।।

এই ১৬ মাত্রার পাদাকুলকে পংক্তির শেষে এক বা দুই মাত্রা কমে গিয়ে অনেক পদে পনের বা চোদ্দ মাত্রার রূপান্তরিত হয়েছে। জয়দেবে যেখানে

প্রত্যেকে পংক্তির লঘু-গুরু দলবিন্যাস-ক্রম সুনির্দিষ্ট রেখেছেন, বিদ্যাপতি সেখানে সুনির্দিষ্ট দলবিন্যাস-ক্রম না রেখে লিখিলেন-

জোরি ভুজযুগ / মোরি বেড়ল / ততহি বয়ন সু / ছন্দ। (৭। ৭। ৭। ৩)

দামচম্পকে / কাম পূজল / যৈসে শারদ / চন্দ।।

বাংলা ভাষার পক্ষে বিদ্যাপতির এই পরিবর্তিত সপ্তমাত্রাপর্বিক মাত্রাবৃত্তই বেশি উপযোগী।

৪.৪। বিদ্যাপতির পদের অলংকার

বিদ্যাপতি পণ্ডিত কবি- রসশাস্ত্রে ও অলংকার শাস্ত্রে তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য। রসসম্পর্কে বিদ্যাপতি দণ্ডী, বা□স্যায়ন প্রমুখদের অনুগত।

বিদ্যাপতি তাঁর পদে রূপক, অতিশয়োক্তি, সমাসোক্তি, অর্থান্তরন্যাস, অপ্রস্তুত প্রশংসা প্রভৃতি অর্থালংকারের বহুল ব্যবহার করেছেন। রসশাস্ত্র ও অলংকারশাস্ত্র সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যাপতির সঙ্গে গোবিন্দদাসের তুলনা এসে পড়ে। প্রকাশভঙ্গির বিভিন্নতায় বিদ্যাপতি যেখানে তরল, গোবিন্দদাস সেখানে সান্দ্র। বিদ্যাপতির রচনায় যুক্তবর্ণের বাহুল্য, অনুপ্রাসাদি শব্দালংকার, দীর্ঘসমাস প্রায় নেই বললেই চলে, কিন্তু গোবিন্দদাস এগুলোর ব্যাপক ব্যবহার করেছেন। গোবিন্দদাসের পদাবলীর কাঠিন্যের কারণরূপে যতীশচন্দ্র 'রূপক, সমাসোক্তি প্রভৃতি জটিল অলংকারপূর্ণ' - বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করেছেন। যদিও এ নির্দেশ তথ্যসম্মত নয়। তবে বিদ্যাপতির পদ অনেকে স্থানে ব্যঞ্জনা সত্ত্বেও কতকটা পানীয়,আর গোবিন্দদাসের পদ চর্বণীয়।

বিদ্যাপতির অলংকারমালামন্ডিত 'হাথক দরপণ' পদটির সঙ্গে গোবিন্দদাসের প্রায় নিরলঙ্কার 'যাঁহা পঁহু অরুণ-চরণ' পদটির তুলনা করলে দেখা যাবে বিদ্যাপতির রাধা চলেছেন সহজ হৃদয়ধর্মের পথে এবং গোবিন্দদাসের রাধা চলেছেন কঠিন দার্শনিকতার পথে। দুখানি পদই রসমধুর। (বৈষ্ণব পদাবলীর ভূমিকা : শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী)

রূপক-উপমাদি অলংকার-সংযোগে বিদ্যাপতির 'পূর্বরাগে'র এই পদটি অতীব উ□কৃষ্ট।

‘হাথক দরপণ মাথক ফুল।

নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল।।

হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।

দেহক সরবস গেহক সার।।

পাখীক পাখ মীনক পানি।

জীবক জীবন হাম ঐছে জানি।।

তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।

বিদ্যাপতি কহ দুহুঁ দোহাঁ হোয়।।’

এখানে উপমা তথা রূপক অলংকারের সাহায্যে কৃষ্ণের আকৃতি নয়, প্রকৃতিরই পরিচয় দেওয়া হয়েছে - যার সারকথা কৃষ্ণই রাধার জীবন।

সংস্কৃত অলংকার ও ছন্দের বিবিধ কারুকৌশল বিদ্যাপতি তাঁর পদাবলীতে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। বলা যায়, পদাবলী সাহিত্যের প্রথম এবং বৈচিত্র্যের ও ভাব-সৌন্দর্যের দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার বিদ্যাপতি। তাঁর অলংকারের প্রয়োগ সফলতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত আলংকারিকদের বর্ণিত শব্দালংকার ও অর্থালংকারের প্রধান প্রধান অলংকারের প্রায় সবগুলিই তিনি তাঁর পদে ব্যবহার করেছেন। উৎপ্রেক্ষা অলংকারের শ্রেষ্ঠ পদগুলি হল-

(১) সজনী ভল কএ পেখন না ভেল।

মেঘ-মাল সয়ঁ তড়িত-লতা জনি হিরদয়ে শেল দেই গেল।

(২) যব গোধুলি সময় বেলি

ধনি মন্দির বাহির ভেলি।

নব জলধর বিজুরি-রেহা

দন্দ পসারি গেলি।।

(৩) চিকুর গলয়ে জলধারা।

মহে বরখিে জনু মোতমি হারা।

বদন মোছল পরচুর।

মাজ ঝিয়ল জনু কনক-মুকুর।।

বদি্যাপতরি রূপক অলংকাররে পদগুল হিল-

(১) বদন সরোরুহ হাসে নুকওলহ তেঁ আকুল মন মোরা।

(২) শীতরে ওঢ়নী পয়িা গীরষিরে বা।

বরষিার ছত্র পয়িা দরয়িার না।।

বদি্যাপতরি দৃষ্টান্ত অলংকাররে পদরে মধ্যে উল্লখেযোগ্য -

অঙ্কুর তপন তাপে যদ জারব

ক করব বারদি মহে।

এ নব যৌবন বরিহে গোঙায়ব

ক করব সো পয়িা নহে।।

নদির্শনা অলংকাররে দৃষ্টান্ত -

জহাঁ জহাঁ পদ-জুগ ধরঈ।

তহাঁ তহাঁ সরোরূহ ভরঈ।।

জহাঁ জহাঁ ঝলকত অঙ্গ।

তহাঁ তহাঁ বজিুর তিরঙ্গ।।

বদি্যাপতরি পদে ব্যতরিকে অলংকাররে ছড়াছড়।ি একট উল্লখেযোগ্য দৃষ্টান্ত -

কবরী-ভয়ে চামরী গরি-িকন্দরে মুখ-ভয়ে চাঁদ অকাসে।

হরণি নিয়ন-ভয়ে স্বরভয়ে কোকলি গতভিয়ে গজবনবাসে।।

শব্দালংকারে বদি্যাপতরি বশিষে অনুরাগ পাঠকরে শ্রুত ও দৃষ্টকিে আকৃষ্ট করে। যমেন-

সখিগণ কন্দরে থোই কলেবর

ঘরে সঞে বাহির হোয়।

বিনি অবলম্বনে উঠই ন পারই

অতয়ে নিবেদলুঁ তোয়।।

কখনো কখনো বিদ্যাপতির মাত্রাতিরিক্ত অলংকার প্রয়োগও লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

মাধব, কি কহব সুন্দরি রূপে

কতকে যতন বিহি আনি সমারল

দেখলি নয়ন সরূপ।।

এই পদে একসঙ্গে উপমা, রূপক, সমাসোক্তি, যমক, অতিশয়োক্তি বিভিন্ন প্রকার অলংকারের সমাবেশ ঘটেছে। আবার অলংকারের প্রাচুর্য আছে কিন্তু অহেতুক বাড়াবাড়ি নেই - এমন একটি পদে তাঁর অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় মেলে। যেমন-

গেলি কামিনি গজহু গামিনি

বিহসি পলটি নিহারি।

ইন্দ্রজালক কুসুম-সায়ক

কুহক ভেলি বরনারি।।

এই পদে উপমা-রূপক-উ□প্রেক্ষা অলংকারের দ্বারা তিনি নবীনা নায়িকা রাধাকে চিত্রিত করেছেন।

৪.৫। বিদ্যাপতির পদে সংগীত

যে যুগে বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হয়েছিল, সে যুগকে গীতি-কবিতার যুগ.বলা হয়। এমন বিরাট এক গীতি-কবিতার ভাণ্ডার বিশ্বের আর কোনও সাহিত্যে আছে কিনা সন্দেহ। বৈষ্ণব পদাবলীর এই সঙ্গীতপ্রাণতায় আপামর রসিক পাঠকসমাজ আকৃষ্ট ও আপ্লুত। স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জয়দেব-বিদ্যাপতি-চন্ডীদাসের অমৃত মধুর পদাবলীর রস আস্বাদন করতেন; বিশেষ

করে পদগুলির সঙ্গীতধর্মিতা তাঁকে অধিকতর আকৃষ্ট করত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত'গ্রন্থে জানিয়েছেন-

চন্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি

কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।

স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রদিনে

গান শুনে পরম আনন্দ।।

বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক অধিকাংশ পদগুলি লৌকিক মৈথিলি প্রভাবিত ব্রজবুলি ভাষায় রচিত; যার মধ্যে রয়েছে এক অসাধারণ সঙ্গীতধর্মিতা। বিদ্যাপতির পদের এই গীতধির্মিতায় বৈষ্ণব মহাজনগণ বা ভক্তগণ হৃদয়ের আকুতি, প্রাণের আরাম খুঁজে পেতেন। তাই বৈষ্ণব আচার্য শ্রীঅদ্বৈত শ্রীচৈতন্যদেবকে অভ্যর্থনা করার সময় বিদ্যাপতির পদ সুর করে গেয়ে বলতেন-

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।

চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ।।

গোবিন্দদাস মনে করেন, বিদ্যাপতি শুধু কবি নন ‘কবিপতি’, যাঁর ‘সরসরস গানে’ ‘জগতচিত রোয়ায়ল’। আর কবি বৈষ্ণবদাসের কাছে জয়দেব হলেন ‘কবি নৃপতি’ আর বিদ্যাপতি হলেন ‘রসধাম’-

‘জয় জয়দেব কবি নৃপতি শিরোমণি, বিদ্যাপতি রসধাম।’

পদাবলী সাহিত্যকে গীতধির্মিতা দানের ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি অবিসংবাদিত সম্রাট। ভজনের উ□কর্ষই যে তাঁর পদাবলীর অন্যতম উদ্দেশ্য - তা একটু গভীরভাবে অনুধাবন করলেই স্পষ্ট হয়। বিদ্যাপতি অনুভব করেছিলেন- সুখ-দুঃখের সকল অনুভবই সঙ্গীতের মাধ্যমেই সার্থকতা পায়। জীবনের মধ্যে যত প্রকার রসানুভূতি আছে, ভালবাসা তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ - যা সঙ্গীতের মাধ্যমেই সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সঙ্গীতধর্মিতার জন্য তাঁর পদাবলীর মাধুর্য সকলের পক্ষে আস্বাদনযোগ্য হয়ে উঠেছে। ব্রজবুলি ভাষার স্বরান্ত স্বভাবের এই স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিকতা, দীর্ঘ-স্বরের গীতিময় লালিত্যই তাঁর পদাবলীর আবেদনকে সর্বজনীন করে তুলেছে। দেশে-

কালের গণ্ডি অতিক্রম করে তাই তাঁর পদ ভারতের বিভিন্নস্থানে বিস্তার লাভ করেছে। বিদ্যাপতির সৌন্দর্য-আকুতি, চিত্রকল্পের বর্ণবিচ্ছুরণ তাঁর পদাবলীর সাংগীতিক ব্যঞ্জনাকে বিশেষ মাত্রা দান করেছে। যেমন, সৌন্দর্যরসিক কবি বিদ্যাপতি রাধিকার রূপ-সৌন্দর্য মুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণের মুখে বলেন-

জঁহা জঁহা ঝলকত অঙ্গ।

তহিঁ তহিঁ বিজুরি তরঙ্গ ।।

আবার বিরহী শ্রীরাধার হাদয়বেদনাকে, বিদ্যাপতি অসামান্য সংগীতিক ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেন-

এ সখি হামারি দুখের নাই ওর।

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর

শূন্য মন্দির মোর।।

কিংবা,

এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব

কি করব সো পিয়া লেহে।

বৈষ্ণব পদাবলীর আরেকটি বৈশিষ্ট্য- পদের শেষে পদ ‘ভণিতা’ যুক্ত। যেমন- ‘ভণই বিদ্যপতি শুন বরনারী’ ইত্যাদি। এমন ভণিতাযুক্ত দুছত্রের বা চার ছত্রের পদকে ‘ধুয়াপদ’ বলা হত। বিদ্যাপতি এমন বহু ধুয়াপদ লিখেছেন। এই সমস্ত ধুয়াপদে সর্বদা সুরের নির্দেশ আছে, এমনকি তালেরও নির্দেশ আছে।

বিদ্যাপতি ছিলেন রাজসভাকবি, পণ্ডিত, বহুভাষাবিদ, সংগীতজ্ঞ, সাংস্কৃতমনস্ক, মুক্ত মানুষ। বিদ্যানুরাগ, শাস্ত্রানুরাগের পাশাপাশি ছিল তাঁর সুগভীর সঙ্গীতানুরাগ। বৈষ্ণব পদাবলীতে বিশেষ করে বিদ্যাপতির পদে গীতধর্মিতা লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- “যাহাকে আমরা গীতিকাব্য বলিয়া থাকি, অর্থা□ যাহা একটুখানির মধ্যে একটিমাত্র ভাবের বিকাশ, ঐ যেমন বিদ্যাপতির -

ঈ ভরা বাদর মাহ ভাদর

শূন্য মন্দরি মোর।

সে-ও আমাদরে মনরে বহুদনিরে অব্যক্ত ভাবরে একটি কোনো সুযোগ আশ্রয় করয়িা ফুটয়িা ওঠা।”

বষ্ৈণব পদসংকলন গ্রন্থ ‘পদকল্পতরু’র সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায়রে মতে, ‘বষ্ৈণব পদাবলী সর্বাংশে উ□কৃষ্ট গীতকিাব্যরে লক্ষণাক্রান্ত।‘ এই বক্তব্যকে আরো স্পষ্ট করে জানান- “বষ্ৈণব পদাবলী যরূেপ নায়ক-নায়কিার ও সখা-সখীদরে উক্তি-প্রত্যুক্তি-প্রধান পালার আকারে সজ্জতি হইয়াছে এবং কীর্তনীয়ারা অনকে সময়ই যে ভাবে কীর্তনরে পালাগুলি গান করয়িা থাকনে, তাহাতে ঐ পালাগুলকিে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র গীতনিাট্য (opera) বলাই সঙ্গত।”

পালার আকারে কছিু কছিু বষ্ৈণব পদ থাকলওে অধকিাংশ পদকর্তা আলাদা-আলাদা ভাবে নজিভাব অনুযায়ী খণ্ড খণ্ড রসব্যঞ্জনাময় পদ-রচনা করায় সাধারণভাবে বষ্ৈণব পদাবলীকে গীতনিাট্য না বলে ‘গীতকিবতিা’ বলাই সঙ্গত মনে হয়। তবে নঃিসন্দহেে তা গীতনিাট্য লক্ষণাক্রান্ত। তাই বষ্ৈণব পদাবলীর সঙ্গীত মাধুর্য ও রসমাধূর্য সম্পর্কে সুধী সমালোচক সতীশচন্দ্র রায়রে মন্তব্য সবশিষে প্রণধিানযোগ্য- “ইহা দৃঢ়তার সহতি বলা যাইতে পারে যে, এরূপ শত শত পদ পাওয়া গয়িাছে যাহাতে কি শব্দ-লালত্যি, কি ছন্দরে ঝঙ্কার, কি ভাবরে চম□কারত্বি, যে দকি্ দয়িা বচিার করা যাউক না কনে, সরূেপ কবতিা শুধু ভারতীয় সাহত্যিে কনে, বোধ হয় বশ্বি-সাহত্যিওে খুব কম আছে।”

৪.৬। অনুশীলনী

১। বদ্যিাপতরি পদাবলীর ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। বদ্যিাপতরি পদাবলীর ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। বদ্যিাপতরি পদে সঙ্গীতধর্মতিা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। ‘এ সখি হামারি দুখরে নাহি ওর’ -পদটরি কাব্যসৌন্দর্য বশ্লিষেণ করুন।

৫। বদ্যিাপতরি পদসজ্জা ও গঠনরীতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৬। বদ্যিাপতরি পদাবলীর অলংকার সম্পর্কে আলোচনা করুন।

মন্তব্য

৭। ‘রসশাস্ত্র ও অলংকার শাস্ত্রে বিদ্যাপতির অসামান্য পাণ্ডিত্য - আলোচনা করুন।

১৮। বিদ্যাপতির পদ সম্পর্কে পণ্ডিতদের অভিমতগুলি আলোচনা করুন।

৪.৭। গ্রন্থপঞ্জি

১। বিদ্যাপতির পদাবলী- খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত

২। পাঁচশত বছরের পদাবলী- বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত

৩। ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য- বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত

৪। বৈষ্ণব পদাবলী- খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও সুকুমার সেন সম্পাদিত

৫। বৈষ্ণব পদাবলী- (সাহিত্য সংসদ) হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

৬। বৈষ্ণব পদ সংকলন- দেবেনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

৭। বৈষ্ণব পদাবলী- সুকুমার সেন সম্পাদিত

৮। বৈষ্ণব পদাবলীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ- পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

৯। চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি- শঙ্করীপ্রসাদ বসু

১০। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত- (প্রথম খণ্ড) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

একক: ৫ : চণ্ডীদাসরে পদাবলী : স্থান-কাল প্রক্ষেতি পরচিয়

বন্যিাসক্রম

৫.১। চন্ডীদাস সমস্যা

৫.২। চন্ডীদাসরে কাল

৫.৩। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে বাংলার রাজনতৈকি প্রক্ষোপট

৫.৪। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে বাংলার সামাজকি-সাংস্কৃতকি ও ধর্মীয় প্রক্ষোপট

৫.৫। চন্ডীদাসরে পরচিয়

৫.৬। চন্ডীদাসরে পদ সংগ্রহ

৫.৭। অনুশীলনী

৫.৮। গ্রন্থপঞ্জি

৫.১। চন্ডীদাস সমস্যা

যমেন জীবনে, সমাজ পরবিশে, রাজনতৈকি ও অর্থ-নতৈকি ক্ষত্রেে সমস্যার অন্ত নইে, তমেনই সাহত্যিজগতওে যে কত সমস্যা জটলিতা, তার অবধি নইে। মধ্যযুগরে বাংলা সাহত্যিে চন্ডীদাস সমস্যা সরেকমই একটি জটলি ও দুরূহ সমস্যা। বাঙালরি যনিি প্রাণরে কবি, অন্যতম প্রয়ি কবি, যাঁর পদাবলীর ভাবগভীরতায় আচ্ছন্ন তাব□ রসকি সমাজ - সইে পরমপ্রয়ি চন্ডীদাস নয়িইে সমস্যা। তার কারণ চণ্ডীদাস-ভণতিায় মলিছে বহু রকমরে পদ, নাম পাওয়া গছে একাধকি চন্ডীদাসরে। যমেন বড়ু চন্ডীদাস, দ্বজি চণ্ডীদাস, দীন চন্ডীদাস, দীন-হীন চন্ডীদাস, রসকি চন্ডীদাস, চন্ডীদাস প্রভৃতি। স্বাভাবকি কারণইে প্রশ্ন উঠছে নানা ধরনরে । যমেন চন্ডীদাস কয়জন, তাঁদরে জন্ম

কখন ও জন্মস্থান কোথায়, তাঁরা একই ব্যক্তি কি না, একই ব্যক্তি হলে বিভিন্ন ভণিতা কেন, ভাব-ভাষা এবং রচনারীতির মধ্যে তারতম্য কেন প্রভৃতি বিষয়ে। তবে একটি বিষয়ে পণ্ডিতমহল একমত যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচয়িতা বড়ু চন্ডীদাস সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং সম্ভবত খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের কোনো ভাগে তাঁর আবির্ভাব। তিনি যে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের অনেক আগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন সে বিষয়ে সকলেই সহমত প্রকাশ করেছেন।

চৈতন্যপূর্বযুগের আর একজন সার্থকনামা চন্ডীদাসের কথা জানা যায় 'চৈতন্যচরিতামৃত', নরহরিদাস, বৈষ্ণবদাস প্রমুখ মহাজনদের পদাবলীতে, সনাতন গোস্বামীর 'বৈষ্ণবতোষণী' টীকায়, নিত্যানন্দ দাসের জীবনীগ্রন্থ 'প্রেমবিলাস' প্রভৃতিতে। ইনি পদাবলীর চণ্ডীদাস, কাব্যরসিকিকুলের পরম প্রিয় পদকর্তা চন্ডীদাস। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এও উল্লেখিত হয়েছে যে, মহাপ্রভু এই চন্ডীদাসের পদ আস্বাদন করে পরম প্রীত হতেন। এই চন্ডীদাস যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' - এর কবি চন্ডীদাস নন, সে বিষয়ে পণ্ডিতগণের প্রায় সকলেই সহমত প্রকাশ করেছেন। এই মত প্রকাশের অন্যতম কারণ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'- এর বড়ু চন্ডীদাসের রচনারীতি ও ভাব-ভাষার সঙ্গে পদাবলীর চন্ডীদাসের পদের ভাব-ভাষা-রস ও রচনারীতির বহুতর প্রভেদে। রচনারীতি তো বটেই, যে বিদগ্ধ প্রেমের পরিচয় চন্ডীদাসের পদাবলীতে পাওয়া যায়, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ তার একান্তই অভাব। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, চৈতন্যপূর্ববর্তীযুগে দুজন চন্ডীদাস বর্তমান ছিলেন। একজন বড়ু চন্ডীদাস, অন্যজন পদাবলীর চন্ডীদাস। তিনি একথাও বলেছেন যে, পদাবলীর চন্ডীদাসের পদ কাব্যগুণে অতি উ□কৃষ্টমানের। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' উগ্র রসের কাব্য, চন্ডীদাসের পদাবলী বিশুদ্ধ প্রেমেরসের কাব্য। আর এ কারণেই বিমানবিহারী মজুমদার বড়ু চন্ডীদাস ও চন্ডীদাসের অভেদে মানেন না। বিমান বিহারী মজুমদার চন্ডীদাসের একশো কুড়িটি পদ তাঁর 'চন্ডীদাস পদাবলী'তে প্রকাশ করেছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর 'চন্ডীদাস' নামাঙ্কিত প্রবন্ধে একজন চৈতন্য-পরবর্তী চন্ডীদাসের কথাও বলেছেন। তিনি দীন চন্ডীদাস। এঁর পদ নিকৃষ্ট মানের। পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে ইনি নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি সপ্তদশ শতকে বর্তমান ছিলেন। হরপ্রসাদ

শাস্ত্রী মহাশয় চৈতন্যোত্তর যুগের আর একজন চন্ডীদাসের কথা বলছেন, যিনি দ্বিজ চন্ডীদাস ভণিতায় পদ রচনা করছেন। বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় দ্বিজ চন্ডীদাসের একশো একটি পদের সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করছেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর 'বড়ু চন্ডীদাসের পদ' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনজন চন্ডীদাসের কথা বলছেন যথা বড়ু চন্ডীদাস, দ্বিজ চন্ডীদাস এবং দীন চন্ডীদাস। তাঁর মতে এঁরা তিন ভিন্ন যুগের কবি। প্রথম জন প্রাক-চৈতন্যোত্তরকালের। ড. সুকুমার সেন তাঁর 'চন্ডীদাস সমস্যা' প্রবন্ধে দুইজন চন্ডীদাসের কথা বলছেন - একজন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচয়িতা বড় চন্ডীদাস, অন্যজন দীন বা দ্বিজ চন্ডীদাস। আবার ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চন্ডীদাস সমস্যার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বলছেন- ".....পদের ভাববস্তু দেখে চন্ডীদাস - নামাঙ্কিত পদাবলী ও আখ্যানে চারটি স্পষ্ট স্তর অনুমান করা যায়। তার মধ্যে দুটি হচ্ছে, আখ্যানের ধারা। একটি বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এই কবি যে চৈতন্যদেবের পূর্বে বর্তমান ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর একজন পুরাণের ছায়ায় ও প্রাচীনতম চণ্ডীদাসের পদের আদর্শে আখ্যানধর্মী পদাবলী রচনা করেছিলেন _ ইনি প্রায়শই দীন চন্ডীদাস ভণিতা ব্যবহার করতেন। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলে মনে করা হয় না। বাকী রইলেন দুজন - যাঁরা কোন আখ্যান রচনা করেননি শুধু পদ লিখেছিলেন। এঁদের মধ্যে যাঁকে কেন্দ্র করে রোমীঘটিত কাহিনীর উদ্ভব হয়, তিনি সহজিয়া চন্ডীদাস। সহজিয়া বৈষ্ণব আদর্শ অনুসরণ করে এই চন্ডীদাস অনেক রাগাত্মিকা পদ (অর্থা রহস্যময় আধ্যাত্মিক পদ রচনা করেছিলেন। ইনিও সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী হতে পারেন। বাকি রইলেন একজন। ইনিই উৎকৃষ্ট পদাবলীর রচনাকার প্রাচীনতর চণ্ডীদাস। চৈতন্যদেব এঁরই পদ থেকে তৃপ্তিলাভ করতেন। এঁকে নিঃসংশয়ে চৈতন্যদেবের কিছু পূর্বে স্থাপন করা যায়। অত্যন্ত জনপ্রিয়তার জন্য এঁর পদে এখন আর বিশেষ কোন প্রাচীন লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে যে সমস্ত পদকর্তা বাংলায় পদ লিখেছিলেন, তাঁদের অনেকেই এঁকে অনুসরণ করেছিলেন। এঁর প্রধান অনুসরণকারী জ্ঞানদাস।"

বস্তুত, এই চন্ডীদাস যে চৈতন্যপূর্ববর্তী, এর সমর্থনে একটি বিশিষ্ট ও অন্যতম যুক্তি হল যে এঁর নামে কোনো গৌরচন্দ্রিকার পদ নেই। অথচ

ছোটো বড়ো, খ্যাত-অখ্যাত প্রায় সকল কবিই চৈতন্য বন্দনার পদ রচনা করে গিয়েছেন, গৌরচন্দ্রিকার পদ লিখে গিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে চন্ডীদাসের মতো বিশেষ প্রতিভাশালী একজন কবি গৌরচন্দ্রিকা ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচনা করবেন না, তা ভাবা যায় না। বরং এটাই সহজগ্রাহ্য যে চৈতন্য-পরবর্তী হলে তিনিও গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ রচনায় প্রয়াসী হতেন। সর্বোপরি, চন্ডীদাস-প্রভাবিত কবি জ্ঞানদাস ষোড়শ শতাব্দীর হলে চণ্ডীদাসকে তাঁর পূর্ববর্তী ভাবাই সংগত। অবশ্য সবই বিতর্কে ভরা। গবেষণা চলছে আজও। হয়তো সর্বজনস্বীকৃত সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসবে আগামী দিনে। চন্ডীদাস-সমস্যার সমাধান ঘটবে। আমরা শুধু একথাই বলবো, যাঁর ভাবগভীর পদামৃত সমুদ্রে অবগাহন করে বাংলার কাব্য-রসিক পরম প্রীতি লাভ করতেন, বলা ভালো করে চলছেন আজও, তিনি আর কেউ নন - সহজ ভাবের সহজ প্রকাশের কবি পদাবলীর চন্ডীদাস।

৫.২। চন্ডীদাসের কাল

চন্ডীদাস মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি-ব্যক্তিত্ব। তিনি বাংলা ও বাঙালির প্রাণের কবি, স্মরণীয় ও বরণীয় কবি। তাঁর সহজ সরল অথচ ভাবগভীর পদামৃত-সমুদ্রে অবগাহন করে পরম তৃপ্তি লাভ করেন না এমন বাঙালি নেই বললেই চলে। কীর্তনীয়া থেকে শুরু করে গোষ্ঠের রাখাল সকলের কণ্ঠেই ভেসে বেড়ায় তাঁর অপূর্ব সব পদ-কীর্তন। কিন্তু এমন যিনি সর্বজনপ্রিয় কবি, তাঁর আবির্ভাব কাল নিয়ে সংশয়ের অন্ত নেই। মন্তব্য নানা জনের নানা রকম। সবই পরম প্রীতিলাভ করতেন স্বয়ং চৈতন্যদেব, সেইহেতু তাঁকে চৈতন্য-পূর্বযুগের কবি বলতে কোনো বাধা নেই। পণ্ডিতগণও সকলেই এবিষয়ে সহমত প্রকাশ করছেন।

'পদকল্পতরু'তে চন্ডীদাস-বিদ্যাপতির সমসাময়িকতা নিয়ে কয়েকটি পদ আছে। একটি পদে পাই -

ভণে বিদ্যাপতি চন্ডীদাস তথি

রূপনারায়ণ সঙ্গে।

দুহুঁ আলঙ্গন করল তখন

ভাসল প্রেমে-তরঙ্গে।।

উল্লেখ্য, এই রূপনারায়ণ মিথিলাধিপতি শিব সিংহের উপনাম। রাজা শিবসিংহ পঞ্চদশ শতকে মিথিলার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ছিলেন বিদ্যাপতির পৃষ্ঠপোষক। বিদ্যাপতি ছিলেন তাঁর সভাকবি। বিদ্যাপতি-সংক্রান্ত নানা দলিল থেকে বোঝা যায় যে, বিদ্যাপতি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন। সেই হিসাবে চন্ডীদাসকে বিদ্যাপতির ন্যায় পঞ্চদশ শতকের কবি রূপে চিহ্নিত করা যায়। বিশেষত বিদ্যাপতি-চন্ডীদাসের মিলন-জ্ঞাপক যে পদটি 'পদকল্পতরু'-তে আছে, সেটিকে প্রামাণিক ধরলে চন্ডীদাসকে পঞ্চদশ শতকের কবি-হিসাবে ধরে নিতে কোনো বাধা নেই। তবে চন্ডীদাস সম্পর্কিত গবেষণা এখনও থেমে নেই। 'পদকল্পতরু'তে সংকলিত পদগুলি আরও তথ্যের আলোকে প্রমাণসিদ্ধ হলে পদাবলীর চন্ডীদাসের আবির্ভাবকাল যে পঞ্চদশ শতাব্দী, এই অভিমত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

৫.৩। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল ব্যাপী পাল বংশ গৌড়ের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। পাল রাজন্যবর্গ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁদের কোন অশ্রদ্ধার ভাব ছিল না। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেনবংশ গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। রাজা বল্লাল সেন এবং পরে তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেন বাংলা দেশে সেন বংশের গৌরব-গরিমা ও আধিপত্য দৃঢ়তর করেন। কর্ণাটদেশীয় এই রাজকুল উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ব্রাহ্মণেতর সাধারণ জনসমাজের সঙ্গে এঁদের বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। বলা যেতে পারে ব্রাহ্মণের জাতিগোষ্ঠীকে তাঁরা উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখতেন। সাহিত্যবিকাশের ক্ষেত্রেও এঁরা প্রজাসাধারণের মুখের ভাষা বা প্রাকৃত-অবহট্ট অপেক্ষা সংস্কৃত ভাষাকেই অধিকতর গুরুত্ব দিতেন। সাধারণের মধ্যে প্রচলিত লৌকিক দেব-দেবীর পূজা-পদ্ধতিকেও তাঁরা সুনজরে দেখতেন না। তথাকথিত নিম্নশ্রেণীয়দের মধ্যে শিক্ষা প্রসারে ছিলেন একেবারেই অনাগ্রহী। স্বাভাবিকভাবেই মানসিক চাপে পিষ্ট সাধারণ মানুষের সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা ব্যাহত হয়। একসময় সেন রাজবংশের শক্তি হ্রাস পায় এবং সেই সুযোগে তুর্কি জাতির অধিনায়ক ইসলাম ধর্মাবলম্বী ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ-বিন-

বখতয়িার খলজি (আনুমানকি ১২০২-১২০৩ খ্রস্টিাব্দ) অতর্কতি আক্রমণে রাজা লক্ষ্মণসনেকে বতিাড়তি করে বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করনে। রাজা লক্ষ্মণ সনে নবদ্বীপ থকেে পূর্ববঙ্গে পালয়িে যান। তুর্কি আক্রমণ ও শাসন ক্ষমতা লাভরে পরবর্তী সময়ে বাংলায় নানা ধরনরে বশিৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, অত্যাচারতি হতে থাকে হন্দিু জনসাধারণ। তুর্কি অপশাসনে জন জীবন অতষ্ঠি হয়ে ওঠে। ইত োমধ্যে ইখতয়িারউদ্দনি একজন আমরিরে দ্বারা নহিত হন। বশে কছিুকাল আমরি-ওমরাহদরে দ্বারা শাসনকার্য চলার পর দল্লিরি পাঠান সুলতান প্রত্যক্ষভাবে বাংলার শাসনকার্য চালাতে থাকনে। প্রায় শতাধকি বছর ধরে বাংলা দল্লিরি সুলতানি শাসনরে অধীন ছলি। পরবর্তীকালে সুলতানবিংশরে অভ্যন্তরীণ কলহ-ববিাদরে সুয োগে বাংলার সামসুদ্দনি ইলয়িাস শাহ গ ৌড়বঙ্গরে সংিহাসন দখল করনে। ইলয়িাসশাহি বংশ ১৩৪২ থকেে ১৪৮৭ খ্রস্টিাব্দ পর্যন্ত সময়কাল বাংলা দশে শাসন করে। কন্তিু ইলয়িাসশাহী শাসনরে শষেদকিে শাসনকার্যে খ োজাদরে প্রাধান্য বৃদ্ধি পায় এবং একসময় সুলতান ঘাতকরে হাতে নহিত হন। প্রায় সাত-আট ব□সর বাংলা খ োজা শাসনাধীন ছলি। এই সময়টা ছলি বাংলার চরম দুর্দনিরে সময় (১৪৮৭ থকেে ১৪৯৩ খ্রি:)। অত্যাচার, অপশাসন, বশিৃঙ্খলা চরমে ওঠে। একসময় অত্যাচারী হাবসি সুলতানকে হত্যা করে হুসনে খাঁ নামে এক রাজকর্মচারী বাংলার সংিহাসনে অধষ্ঠিতি হন। অভ্যুদতি হয় হুসনেশাহি রাজবংশ (১৪৯৩ খ্রস্টিাব্দ)। হুসনে খাঁ আলাউদ্দনি হুসনে শাহ নাম নয়িে বাংলার সংিহাসনে অধষ্ঠিতি হন এবং হুসনেশাহি রাজবংশরে প্রতষ্ঠিা করনে। হুসনে শাহ বাংলার সর্বাত্মক উন্নয়নে প্রয়াসী হন এবং জাত-ধির্ম নর্বিশিষে প্রজা-সাধারণরে আস্থা ও সমর্থনলাভে সক্ষম হন। শ্রদ্ধয়ে সমাল োচক শ্রী ভূদবে চ ৌধুরী তাঁর 'বাংলা সাহত্যিরে ইতকিথা' গ্রন্থে হুসনে শাহ সম্পর্কে বলছেনে - "বদান্যতা, উদারতা এবং ধর্ম নরিপক্ষে মানবকি সহৃদয়তা নয়িে ভারতীয় মুসলমান শাসকদরে মধ্যে তনিি একমাত্র সম্রাট আকবররে সঙ্গইে তুলনীয় বলে কীর্তত্তি হয়ছেনে। এ সম্বন্ধে অধুনা বপিরীত মতরে প্রামাণ্যও প্রদর্শতি হচ্ছ।ে কন্তিু তাহলওে সর্বাত্মক বঙ্গ-সংস্কৃতরি মহ□ গ োষ্ঠী হসিাবে তনিি মুসলমান শাসকদরে মধ্যে নঃিসন্দহেে ছলিনে অনন্যতুল্য।"

৫.৪। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট

তুর্কি আক্রমণোত্তর বাংলা ও বাঙালির জীবনে নেমে এসেছিল ঘোর দুর্দিন। শাসককুলের মধ্যে চলেছিল পারস্পরিক বিদ্বেষ, হানাহানি, গুপ্তহত্যা। প্রজাসাধারণ বিশেষ করে হিন্দু প্রজাদের প্রতি তাঁরা ছিলেন চরম বিদ্বেষপরায়ণ। হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করে, হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করে তাঁরা উল্লাস বোধ করতেন। বিশেষ করে ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহি সুশাসন প্রবর্তনের পূর্বে বাঙালির জাতীয় জীবন এক নীরন্ধ্র বিনিষ্টির ঐতিহ্যে ভরপুর হয়েছিল। স্বভাবতই জীবনের এই বিপর্যয় লগ্নে কোনো সৃজনকর্ম সম্ভব হয়নি। নিছক গতানুগতিক ধারায় কোনো কিছু রচিত হলেও সর্বাত্মক বিধ্বংসের হাত থেকে তা রক্ষা পায়নি।

বস্তুত, খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকটি ছিল বাংলা সাহিত্যের প্রায় বন্ধ্যা যুগ। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন - "সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে খ্রীঃ ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত বিশেষ কোন সাহিত্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়নি; অন্তত চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রচিত কোন গ্রন্থের সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি। সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ সুলতান হবার আগে পর্যন্ত শ-দেড়েক বছর ধরে গোটা বাংলা দেশেই পাঠান শাসনের বিশৃঙ্খলা চলেছিল। বাঙালি হিন্দু ধর্ম হারাবার ভয়ে সঙ্কুচিত হয়েছিল, সামাজিক জীবনেও শান্তি শৃঙ্খলা ছিল না। সুতরাং ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর উক্রান্তির যুগে সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরে চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইলিয়াস শাহী আমলে দেশে খানিকটা শান্তি ফিরে এলে বাংলা সাহিত্যের রচনা ও অনুশীলন আবার শুরু হয়। ..... সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনের অনুচিন্তন আবার বিদ্বৎসমাজে যথাযোগ্য স্থান করে নেয়। চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্বেই সমাজে ও ধর্মাচরণে বৈষ্ণব আচার অনুষ্ঠান বেশ জনপ্রিয় হতে আরম্ভ করেছিল। রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের মূল সংস্কৃতে পুঁথির নকল এবং বাংলা পয়ার-ত্রিপদীতে তার অনুবাদও আরম্ভ হয়ে যায়। ..... ভাগবত, জয়দেবের গীতগোবিন্দ ইত্যাদির প্রভাবে চৈতন্যদেবের পূর্বেই বাংলার মাটি বৈষ্ণব ভাবরসে সজল হয়ে উঠেছিল।" এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন- "কেউ কেউ অনুমান করেছেন, খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ

ভক্ত মাধবেন্দ্র পুরী বাংলা দেশে ভাগবত প্রচার করেন এবং তারপর থেকেই এদেশে ভাগবতাশ্রয়ী কৃষ্ণলীলা ও ভক্তিমার্গের বৈষ্ণব আদর্শ জনসমাজে ধীরে ধীরে প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। 'রায়মুকুট' উপাধিধারী বৃহস্পতি এবং প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক বাসুদেব সার্বভৌম জ্ঞানপন্থা ছেড়ে বৈষ্ণব ভক্তিপন্থা গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য বাসুদেবের এই পরিবর্তনের মূলে ছিল তরুণ সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের প্রভাব। জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রভাবও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এ ছাড়াও বিল্বমঙ্গলের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত', 'ব্রহ্মসংহিতা', ব্যোমদেবের 'মুক্তাফল' বিষ্ণুপুরীর 'বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী' শ্রীধর গোস্বামীর ভাগবতের টীকা প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ পণ্ডিত সমাজে বৈষ্ণবধর্মের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেছিল। এই সমস্ত থেকে দেখা যাচ্ছে প্রাক-চৈতন্যযুগেই বাংলা দেশের জনসমাজে ও বিদ্বৎগোষ্ঠীতে বৈষ্ণবধর্মের বেশ গভীর রেখাপাত ঘটেছিল। ..... তবে প্রাক-চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে তত্ত্বগত মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। প্রাক-চৈতন্যযুগের বৈষ্ণবধর্মে ভক্তি স্বীকৃত হলেও তাকে 'বৈধীভক্তি' বলা হয়। বিধি-বিধান ও শাস্ত্র গ্রন্থের নির্দেশে যে ভক্তিকে পরিচালিত করে তাকে 'বৈধীভক্তি' নামে অভিহিত করা হয়। ভক্তিশাস্ত্রের ইতিহাসে বৈধী ভক্তির স্থান খুব উচ্চে নয়। চৈতন্যপ্রভাবে যে বৈষ্ণব ভক্তির উৎপত্তি হল তা 'রাগানুগা' ভক্তি নামে পরিচিত। ..... চৈতন্যপ্রভাবে ক্রমে ক্রমে বৈধী ভক্তির স্থান সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল, এবং সাহিত্য ও সমাজে রাগানুগা ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দখল করল। রাধাকৃষ্ণলীলাই হল এই প্রেমভক্তির সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যই সেই বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির জীবন্ত বিগ্রহ বলে পূজিত হয়েছেন।"

৫.৫। চন্ডীদাসের পরিচয়

পদাবলী সাহিত্যে একাধিক চন্ডীদাসের পরিচয় মেলে। নানা ভণিতা যুক্ত পদ আবিষ্কৃত হয়েছে নানা স্থান থেকে, নানা জনের দ্বারা। যথা বড়ু চন্ডীদাস, দ্বিজ চন্ডীদাস, দীন চন্ডীদাস, রসিক চন্ডীদাস, দীনহীন চণ্ডীদাস, চন্ডীদাস প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে দু-জন প্রাক-চৈতন্য যুগের কবি। একজন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচয়িতা বড়ু চন্ডীদাস, অন্যজন পদকর্তা চন্ডীদাস। এই পদকর্তা চন্ডীদাস বাংলার প্রাণের কবি, রসপিপাসু রসিকজনের হৃদয়ের কবি। বস্তুত, সহজ ভাষার, সহজ ভাবের কবিত্ব গুণে

চণ্ডীদাস বাংলার প্রাচীন কবিদের প্রধান স্থানীয়। বলা বাহুল্য, চন্ডীদাসের পদের আবেগব্যাকুলতা, সুগভীর মর্মস্পর্শিতা, গীতিধর্মিতা এবং অধ্যাত্মব্যঞ্জনার প্রতিতুলনা পদাবলী সাহিত্যে দুর্লভ। স্বয়ং চৈতন্যদেব চন্ডীদাসের পদ-রস আস্বাদন করে পরম প্রীতি লাভ করতেন। পরিতাপের বিষয়, এমন একজন বিশিষ্ট কবির জীবনেতিহাস আজও স্পষ্ট নয়। এই বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি আজও । বিভিন্ন পণ্ডিতের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত বিভিন্ন রকমের। তবে একটি বিষয়ে অনেকেই একমত হয়েছেন যে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে একজন প্রতিভাবান চণ্ডীদাসের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং স্বয়ং চৈতন্যদেব তাঁর পদ আস্বাদন করে আনন্দ লাভ করতেন । এই হিসাবে এই পদাবলীর চন্ডীদাস সম্ভবত পঞ্চদশ শতকে বর্তমান ছিলেন। জন বিমস্-এর মতে চণ্ডীদাসের জন্ম ১৪১৭ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যু হয় ১৪৭৮ খ্রিস্টাব্দে। তবে এই অভিমতের কোনো তথ্য-উ□স তিনি দেননি।

চন্ডীদাসের জন্ম স্থান নিয়েও নানাজন নানা মত পোষণ করেন। কেউ বলেন বীরভূম জেলার অন্তর্গত নানুর বা নান্নুর গ্রামে তাঁর বসবাস ছিল। তিনি বাশুলী দেবীর উপাসক ছিলেন। সেই বাশুলী দেবীর মন্দির এখনও আছে নানুর গ্রামে। আবার কেউ কেউ মনে করেন বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রাম চন্ডীদাসের জন্মভূমি। ছাতনাতেও বাশুলী মন্দির বর্তমান। বস্তুত, চণ্ডীদাসের অধিকার উভয় জেলার মানুষেরই। হতে পারে, চণ্ডীদাস নামে একজন কবি ছাতনায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং বাশুলী উপাসক ছিলেন। সম্ভবত তিনি ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’-এর কবি বড়ু চন্ডীদাস। কিন্তু যে চণ্ডীদাসের পদাবলীতে সারা দেশ মুগ্ধ, তিনি বীরভূমের নান্নুর গ্রামেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষত তাঁর পদে নান্নুর গ্রামেরই উল্লেখ আছে। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় পন্ডিত বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর ‘চন্ডীদাসের পদাবলী’ গ্রন্থে বলেছেন - “চন্ডীদাস নান্নুরে থাকিতেন বলিয়া প্রবাদ আছে। ‘পদকল্পতরু’তে (৮৭৭) ধৃত ‘কানুর পরিচিতি চন্দনের রীতি’ ইত্যাদি পদে পাওয়া যায়-

‘নান্নুরের মাঠে গ্রামের হাটে

বাশুলী আছয়ে যথা।

তাহার আদেশে কহে চন্ডীদাসে

সুখ যে পাইব কোথা ।।’

বীরভূম জেলার কীর্ণাহার স্টেশনের চার মাইল দূরে যে নান্নুর গ্রাম আছে, তাহার নাম পূর্বে নাকি নাদুড় ছিল। এইখানে এক বাশুলী দেবী আছেন। সেখানে চন্ডীদাসের ভিটা ও রামীর কাপড় কাচার পাটও দেখানো হইয়া থাকে। বাঁকুড়া জেলার ছাতনার নিকট এক নুনুআর আঠ আছে (চন্ডীদাস চরিত, পৃ. ১১); উহাকেই নান্নুর বলিয়া চালাইয়া দিবার চেষ্টা চলিতেছে। ছাতনাতেও বাশুলী দেবীর মন্দির আছে এবং চণ্ডীদাসের স্মৃতিবিজড়িত স্থান সমূহ আছে।

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’র কবি অনন্ত বড়ু চন্ডীদাস খুব সম্ভব ছাতনার বাশুলীর উপাসক ছিলেন। এ বাশুলীর ধ্যানমন্ত্রটি সত্যকিঙ্কর সাহানা মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন (চণ্ডীদাস প্রসঙ্গ, পৃ. ১৫)। উহা এইরূপ-

ওঁ আয়াতা স্বর্গলোকাদিহ ভূবনতলে কুন্ডলে কর্ণপুরে

সিন্দুরাভাবসানা প্রবিকটদশনা মুন্ডমালা চ কণ্ঠে।

ক্রীড়ার্থে হাস্যযুক্তা পদযুগকমলে নূপুরং বাদয়ন্তী

কৃত্বা হস্তে চ খড়্গং পিবি পিবি রুধিরং বাসলী পাতু সানঃ।।

রুধিরপানরতা বিকটদশনা মুন্ডমালিনী বাসলী বা বাশুলীর গণ অথবা উপাসকের পক্ষে রাধাকৃষ্ণের ঢামালী বা ধামালী অর্থা□ কেচ্ছা লেখা অস্বাভাবিক নহে। কৃষ্ণকীর্তনে কোথাও রজকিনীর কোন প্রকার উল্লেখ বা ইঙ্গিত নাই। বীরভূম জেলার নান্নুরে অবস্থিত বাশুলির উপাসকের পক্ষে শুধু চন্ডীদাস ভণিতাযুক্ত পদসমূহ রচনা করা সম্ভব। কেননা, এ বাশুলি তন্ত্রোক্ত দ্বিভুজা খড়্গ-খেটকধারিনী মুণ্ডমালিনী নহেন, পরন্তু চতুর্ভূজা বীণাবাদিনী বিশালাক্ষী। তিনি বৈষ্ণব না হইলেও উগ্র শাক্ত ছিলেন না। তাঁহার পদসমূহে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরত্ব আরোপিত হয় নাই। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ কিন্তু বারংবার বড়াই করিয়া বলেন যে, তিনি ভগবানের অবতার।”

অনুমান, চন্ডীদাস বীরভূমের নান্নুরেরই অধিবাসী ছিলেন। জাতিতে ছিলেন ব্রাহ্মণ। বাশুলী দেবীর উপাসক হলেও পরবর্তীকালে সহজিয়া সাধনমার্গের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন রামী নামে এক রজকিনীর প্রেমে কলঙ্ক হেতু তাঁকে সমাজচ্যুত হতে হয়। কিন্তু তাতে চণ্ডীদাসের চিত্তে কোনোরূপ বৈকল্য

দেখো দেয়েনি। বস্তুত, রামী শুধু চন্ডীদাসরে প্রমেকিাই ছলিনে না, ছলিনে কবরি প্ররেণাদাত্রীও। রামী নজিওে কবত্বিশক্তরি অধকিারনিী ছলিনে। রামী-রচতি কছিু গীতকিা তার সাক্ষ্য বহন কর। রামী রচতি গীতকিার উপর নর্িভর কর দীনশেচন্দ্র সনে মহাশয় চণ্ডীদাসরে শষে জীবনরে মর্মষ্পুদ ঘটনার বর্ণনা দয়িে লখিছেনে - "চন্ডীদাস গৌড়রে নবাবরে রাজসভায় গান গাহতিে অনুরুদ্ধ হইয়া তথায় গমন করনে। সইে গানে বগেম মুগ্ধ হইয়া যান এবং চন্ডীদাসরে গুণরে অনুরাগনিী হন। নবাবরে নকিটে তনিি নর্িভীকভাবে এই কথা স্বীকার করনে। নবাবরে আদশেে চণ্ডীদাস হস্তী পৃষ্ঠে আবদ্ধ হইয়া দারুন কশাঘাতে প্রাণত্যাগ করনে।..... রামী ও বগেম সকলইে কবরি সইে শোচনীয় পরণিাম দখেয়িা ছলিনে। চন্ডীদাস মৃত্যুকালে সমস্ত শারীরকি যন্ত্রণা সহ্য করয়িা ও রামীর দকিে দুইটি নশ্চিল চক্ষুর দৃষ্টি আবদ্ধ রাখয়িাছলিনে। বগেম এই দৃশ্য দর্শন করয়িা মূর্ছতি হন। সইে মূর্ছা তাঁহার ভঙ্গ হইল না। বগেমরে মৃত্যুতে রামীর হৃদয় শ্রদ্ধাতে পূর্ণ হইয়া উঠলি এবং তনিি মৃতদহেরে পদযুগল স্পর্শ করয়িা শোক প্রকাশ করলিনে। এই অপূর্ব শোকগীতকিা হইতে ইহাও জানা যায়, চন্ডীদাসও বগেমরে প্রতি অনুরক্ত হইয়াছলিনে।" চন্ডীদাসরে জীবনরে অন্তমি পরণিতি সম্পর্কে ভন্নি কংিবদন্তী আছ। কোথাও আছে চন্ডীদাস এক রাজার ক্রোধরে স্বীকার হয়ে মত্ত হস্তীর পদতলে পষ্টি হয়ে প্রাণ হারান। আবার অন্য এক কংিবদন্তীতে আছে চন্ডীদাস কীর্তন করার সময় নাট্যশালা চাপা পড়ে মৃত্যু বরণ করনে। এও আছনে য সইে নাট্যশালাটি নবাব-সন্যেরে কামানরে গোলায় ধ্বংস হয়ছেলি। উল্লখ্যে, এসবই জনশ্রুতি, তথ্য-প্রমাণ সদ্ধি নয়।

৫.৬। চন্ডীদাসরে পদ সংগ্রহ

বাংলা সাহত্যিে বষ্ণেব পদাবলীর গুরুত্ব অপরসীম। দ্বাদশ শতকে কবি জয়দবেরে মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলীর মধ্য দয়িে এই বশিষ্টি কাব্যশাখার সূচনা। মধ্যযুগে বদ্যিাপতি ও চন্ডীদাসরে হাতে তার চরম বকিাশ। মথিলিার কবি বদ্যিাপতি এবং বাংলার কবি চন্ডীদাসরে পদাবলী কাব্য-রসকি বাঙালি হৃদয়-মনকে আকৃষ্ট করছে, পরম পরতিৃপ্ত দয়িছে যমেন, তমেনই তাঁদরে পদসংগ্রহ ও সংকলনে উ□সাহতি করছে বদ্বি□সমাজক। তাঁদরে ঐকান্তকি প্রয়াসে সংগৃহীত ও সংকলতি পদভান্ডার কাব্যরস পপিাসুজনরে গোচরীভূত হয়ছে।

বাংলাদেশে বৈষ্ণবপদ সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়াস লক্ষিত হয় বহু পূর্ব থেকেই। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি', 'পদামৃতসমুদ্র' এবং 'পদকল্পতরু'-র কথা। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'-তে পঁয়তাল্লিশ জন কবির তিনিশতাধিক পদ, রাধামোহন ঠাকুর সম্পাদিত 'পদামৃত সমুদ্র'-এ উনচল্লিশ জন কবির সাতশো ছেচল্লিশটি পদ, বৈষ্ণবদাসের 'পদকল্পতরু'তে বিভিন্ন পদকর্তা ছাড়াও চণ্ডীদাস-ভণিতায় একশো উনিশ পদ, গৌরসুন্দর দাসের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'কীর্তনানন্দ'-এ এক হাজার একশো উনিশটি পদ সংকলিত হয়েছে। চন্ডীদাসের পদসংগ্রহ ও সংকলনে পরবর্তীকালে বহু রসগ্রাহী ব্যক্তি আগ্রহী হন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রমণীমোহন মল্লিক, দুর্গাদাস লাহিড়ী, নীলরতন মুখোপাধ্যায়, ড. দীনেশচন্দ্র সেন, মণীন্দ্রমোহন বসু, ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বিমানবিহারী মজুমদার, ব্যোমকেশ মুস্তাফী প্রমুখ পন্ডিতবর্গ।

রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় ১৩০৩ বঙ্গাব্দে তাঁর 'চন্ডীদাস' গ্রন্থের দুটি সংস্করণে চন্ডীদাসের ছশো একচল্লিশটি পদ প্রকাশ করেন । দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় ১৩২২ বঙ্গাব্দে তাঁর বৈষ্ণবপদলহরী'তে তিনশো ছত্রিশটি পদ সংকলন করেন। নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় নানা পুঁথিপত্র থেকে সংগ্রহ করে ও লোকমুখে শুনে চন্ডীদাসের আটশো আটত্রিশটি পদ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন ১৩২২ বঙ্গাব্দে। অবশ্য সেইসব পদের অনেকগুলিই দীন চন্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত। ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় তাঁর 'চন্ডীদাসের পদাবলী'তে দুশো একুশটি পদ প্রকাশ করেন, যাদের মধ্যে একশো কুড়িটি পদ শুধু চন্ডীদাস নামাঙ্কিত। বাকি একশো একটি পদের মধ্যে বেশ কিছু পদও প্রাক-চৈতন্য যুগের চণ্ডীদাসের রচনা বলেই তিনি মনে করেন। বিশেষত আটচল্লিশটি পদ চন্ডীদাসের ভণিতা যুক্ত। বাকি পদগুলি বড়ু চন্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, নরহরি, অনন্ত, যদুনাথ প্রমুখ কবির ভণিতাযুক্ত। সাহিত্যরত্ন শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' গ্রন্থে বিভিন্ন চন্ডীদাসের ভণিতায় অনেকগুলি পদ সংকলিত হয়েছে। তাতে চন্ডীদাস ('শ্রীকৃষ্ণকীর্তন') এর একত্রিশটি বড়ু চন্ডীদাসের (পদাবলী) চব্বিশটি, দ্বিজ চন্ডীদাসের একাশিটি এবং দীন

চণ্ডীদাসের ত্রিশটি পদ মুদ্রিত হয়েছে। এই সকল পদসংকলন গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বিশেষ। এসব গ্রন্থ যদি রচিত না হত, সংকলকবৃন্দ যদি এ কাজ না করতেন, তা হলে হারিয়ে যেতে বহু শত বৈষ্ণব পদাবলী, বঞ্চিত হতেন কাব্যরস পিপাসুজন, স্তব্ধ হয়ে যেতে পদকর্তাগণের সৃষ্টি সম্ভারের মূল্যায়ণ প্রক্রিয়াও।

৫.৭। অনুশীলনী

১। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের বাংলার রাজনৈতিক চালচিত্র বর্ণনা করুন।

২। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের বাংলা ভাষার সাহিত্য নিদর্শন উল্লেখ করুন।

৩। বৈষ্ণব সাহিত্যে কতজন চন্ডীদাসের পরিচয় পাওয়া যায়? তাঁদের মধ্যে কে কোন্ সময়ে বর্তমান ছিলেন? তাঁদের মধ্যে কোন্ চন্ডীদাস কোন্ গুণে বাঙালির মনপ্রাণ হরণ করেছিলেন?

৪। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করুন - বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাস।

৫। চন্ডীদাস সমস্যা কী? এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

৬। চন্ডীদাস কোন্ সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন? সেই সময়ের বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাতাবরণের পরিচয় দান করুন।

৫.৮। গ্রন্থপঞ্জি

১। সুকুমার সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (প্রথম খণ্ড)।

২। ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ইতকিথা (প্রথম পর্যায়)।

৩। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড)।

৪। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড) ।

৫। বিমানবিহারী মজুমদার : ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য।

৬। বিমানবিহারী মজুমদার : পাঁচশত ব□সরের পদাবলী ।

৭। বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত : চন্ডীদাসের পদাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষ□)।

৮। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : পদাবলী পরিচয় ।

৯। শঙ্করীপ্রসাদ বসু : চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি।

১০। মিহির চৌধুরী কামিল্যা : নির্বাচিত বৈষ্ণবপদাবলী : পাঠ ও আস্বাদন।

১১। সনাতন গোস্বামী : বৈষ্ণব পদাবলী।

১২। ক্ষেত্র গুপ্ত : বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস।

একক: ৬ : চন্ডীদাসরে পদ বশি্লষেণ

বন্যিাসক্রম

৬.১। উদ্দশে্য

৬.২। চন্ডীদাসরে পদে পূর্বরাগ ও অনুরাগ

৬.৩। চন্ডীদাসরে পদে অভসিার

৬.৪। চন্ডীদাসরে পদে বাসকসজ্জা

৬.৫। চন্ডীদাসরে পদে মান

৬.৬। চন্ডীদাসরে পদে প্রমে বচৈত্যি

৬.৭। চন্ডীদাসরে পদে আক্ষপোনুরাগ

৬.৮। চণ্ডীদাসরে পদে ভাবসম্মলিন

৬.৯। অনুশীলনী

৬.১০। গ্রন্থপঞ্জি

৬.১। উদ্দশে্য

মধ্যযুগরে বাংলা সাহত্যিরে দুটি প্রধান শাখা মঙ্গলকাব্য ও বষ্ণেব পদাবলী। মঙ্গলকাব্যগুলতিে চত্রিায়তি হয়ছে দবেকথা এবং তারই অন্তরালে সমসাময়কি সমাজ-জীবনরে বাস্তব চত্রি, দশে-কালরে ছবি। এদকি থকেে মঙ্গল কাব্যগুলকিে কছিুটা বস্তুধর্মী সাহত্যিরে অন্তর্ভুক্ত করা যতেে পার। অন্যদকিে বষ্ণেব পদসাহত্যিে সমাজজীবনরে ছবি অপক্ষো ব্যক্তি-হৃদয়রে স্বপ্নরঙনি অনুভূতগিুলি নানা বর্ণে রঞ্জতি হয়ে প্রকাশলাভ করছে। এই সাহত্যিও বষ্ণেব-ধর্ম-ভত্তিকি। তবে কবকিুলরে অজ্ঞাতসারইে তা জীবনকাব্য হয়ে উঠছে। বস্তুত ধর্মাশ্রয়ী হলওে "মানব হৃদয়রে প্রবল উ□কন্ঠা ও অভসিূক্ষ্ম হৃদয়ানুভূতি এবং সুকোমল প্রমেমাধুর্য,

অতীন্দ্রিয় জীবনবোধ ও বিস্ময়বিমুগ্ধ ভাববিহ্বল রোমান্টিক জীবনচেতনা এবং জানা-অজানা, ধরা-অধরা ও পাওয়া - না পাওয়ার মিলন বিরহের যে প্রেমসংগীত বিচিত্র সুরে ও রাগলীলে বৈষ্ণব পদাবলীতে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে তা জীবদদৃষ্টির গভীরতায় ও অনন্ত রহস্যময় সুরমূর্ছনায় অপূর্ব রসসৌন্দর্যে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।" বৈষ্ণব সাহিত্য রোমান্টিক গীতকিবিতার স্তরে উন্নীত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ এই সাহিত্যের সূচনা জয়দেবে, সমৃদ্ধি বিদ্যাপতি-চন্ডীদাসে এবং বিপুল বিস্তার রামানন্দ বসু, নরহরি চক্রবর্তী, বাসুদেব ঘোষ, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, রাধামোহন ঠাকুর প্রমুখ কবিবৃন্দের হাতে। এই এককের উদ্দেশ্য হল বৈষ্ণব পদকর্তা চন্ডীদাসের কৃতিত্ব তুলে ধরা, সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত প্রশ্ন কী ধরনের হতে পারে তার নমুনা তুলে ধরা।

৬.২। চন্ডীদাসের পদে পূর্বরাগ ও অনুরাগ

পূর্বরাগ :

পূর্বরাগ প্রেমের প্রথম উন্মেষজাত হৃদয়রাগ, প্রেমের প্রথম জাগরণ । নায়ক-নায়িকা চিত্তে এই প্রেমের জাগরণ ঘটে দর্শন ও শ্রবণের দ্বারা। পূর্বরাগ-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর বিশিষ্ট গ্রন্থ 'উজ্জ্বলনীলমণি'-তে বলছেন-

'রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শন শ্রবণাদিজা।

তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্চতে।'

অর্থাৎ মিলনের পূর্বে দর্শন ও শ্রবণ-জনিত কারণে মিলনেচ্ছাময় যে রতির জন্ম হয় এবং যা নায়ক-নায়িকা উভয়ের হৃদয়কে উন্মীলিত করে, তাকে পূর্বরাগ বলে। দর্শন ও শ্রবণ ঘটতে পারে নানাভাবে । যথা সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রপটে দর্শন, স্বপ্নে দর্শন, জলে প্রতিবিম্বিত দর্শন, গুণকীর্তন শ্রবণ, বংশী ধ্বনি শ্রবণ, দূতীমুখে শ্রবণ, সখীমুখে শ্রবণ, ভাটমুখে শ্রবণ প্রভৃতি। পূর্বরাগ জাগ্রত হলে প্রিয়ি সঙ্গলালসা, প্রিয়ির জন্য উদবেগ ব্যকুলতা, বাহ্যজ্ঞান শূন্যতা, উদাসীনতা, অধীরচিত্ততা প্রভৃতি ভাবসমূহ নায়ক-নায়িকার মধ্যে দৃষ্ট হয়।

লৌকিক অর্থে পূর্বরাগ প্রেমের প্রথম উন্মেষজাত হৃদয়রাগ। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যে এর ভিন্ন তাৎপর্য আছে। এখানে প্রেম হল ঈশ্বারানুরাগ, প্রেমিক-প্রেমিকা নায়কোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ও নায়িকাশ্রেষ্ঠা-শ্রীরাধা। পদকর্তারা অঙ্কন করছেন তাঁদের দিব্য প্রেমের রথোচিত্র। অবশ্য রাধা-কৃষ্ণ তথা জীবাত্মা-পরমাত্মার লীলাচিত্র অঙ্কিত হলেও পদগুলি এত বেশি মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ যে সেগুলিকে বাস্তব প্রেমের কবিতা হিসাবে গ্রহণ করতে দ্বিধা জাগে না। প্রিয়তম কৃষ্ণকে কাছে পাওয়ার জন্য রাধার অধীরতা, কৃষ্ণ-প্রেমে বিভোরতা বাস্তব নায়িকা-চিত্রকেও আভাসিত করে । আর এখানেই কবিকুলের সবিশেষ সার্থকতা।

পূর্ববাগের পদ রচনায় নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন একাধিক পদকর্তা। প্রাক্-চৈতন্যযুগের বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাস এবং চৈতন্যোত্তর যুগের গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস পূর্বরাগ রস পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য কবি। শুধু অভিসার নয়, পূর্বরাগের পদ রচনাতেও বিদ্যাপতির কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ। তাঁর রচিত পূর্বরাগের পদগুলির মধ্যে ‘হাথক দরপন মাথক ফুল’ পদটি অনুপম। পদটির অধ্যাত্মব্যঞ্জনাও সুগভীর । শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে শ্রীমতী রাধা গভীর মর্মবেদনার সঙ্গে বলছেন, তুমি আমার সর্বস্ব হলেও তোমার স্বরূপ বুঝতে পারলাম না। সত্যই তো ঈশ্বরের অপার রহস্যের সন্ধান পায় কে?

চৈতন্যপূর্ব যুগের অন্যতম পদকর্তা চন্ডীদাস পূর্বরাগ রস-পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর পূর্বরাগের পদগুলিতে শ্রীরাধার হৃদয়ার্তি ও আবেগ-ব্যাকুলতা যেরূপ বেদনাঘন ভাষায় প্রকাশিত, সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে তার তুলনা মেলে না। সহজ সরল, একেবারে প্রাত্যহিক মুখের ভাষায় পূর্বরাগে অনুরাগিণী শ্রীমতী রাধার প্রেমগভীরতার যে চিত্র চন্ডীদাস এঁকেছেন তা শুধু দুর্লভ নয়, সু-দুর্লভ। চন্ডীদাসের রাধা শুধু, প্রেমিকা নন, প্রেমসাধিকা; তাঁর প্রেমসাধনা শ্রেয়োবোধের সাধনা। আর সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য তিনি সব কিছু পরিত্যাগ করতেও দ্বিধান্বিতা নন। তাই তো তিনি বৈরাগ্যময়ী, তপস্বিনী।

‘রাধার কি হইল অন্তরে বেথা।

বসিয়া বরিলে থাকয়ে একলে

না শুনে কাহার কথা।।

সদাই ধিয়ানে চাহে মেঘপানে

না চলে নয়ানতারা।

বরিত আহারে রাঙ্গা বাস পরে

যেমত যোগিনী পারা।।

আউলাইয়া বেণী ফুলতে গাঁথনী

দেখয়ে খসাইয়া চুলি।

হসতি বদনে চাহি মেঘ পানে

কি কহে দুহাত তুলি।।

এক দিঠি করি ময়ূরা ময়ূরী

কণ্ঠ করে নিরিখিনে।

চন্ডীদাসে কয় নব পরিচয়

কালিয়া বধুর সনে।।'

রাধা কৃষ্ণনুরাগিণী। মিলনের জন্য আকুল-ব্যাকুল। পারিপার্শ্বকি সকল বিষয়েই উদাসীন। শুধু কৃষ্ণচিন্তায় বিভোর, একান্ত তন্ময়। তাই 'না শুনে কাহারো কথা'। শ্রীমতী রাধার কাছে আজ সব কিছুই কৃষ্ণময়। কৃষ্ণের বর্ণ নবজলধরসদৃশ, তাই রাধা একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন মেঘের দিকে। কৃষ্ণর বর্ণসাদৃশ্য আছে বলে খোঁপা খুলে আপন কেশপাশ দর্শন করেন। ময়ূরের কণ্ঠের মত কৃষ্ণের বর্ণ বলে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকেন ময়ূর-ময়ূরীর দিকে। শ্রীমতী রাধার নব পরিচয় হয়েছে 'কালিয়া বঁধুর সনে'। তাঁকে একান্ত করে লাভ করার আকাঙ্ক্ষায় তিনি আহারনিদ্রা ত্যাগ করেছেন, সমাজ-সংসারের মায়া ত্যাগ করে অঙ্গে ধারণ করেছেন গৈরিক বসন, যৌবনে যোগিনী সেজেছেন। এ চিত্র অসাধারণ এমন ঐকান্তিকতা, এমন

ভাবতন্ময়তা, সর্বোপরি এমন আত্মনিবেদিতা নায়িকাচিত্র অঙ্কন করা চন্ডীদাসের পক্ষেই সম্ভব।

‘ কাহারে কহিব মনের বেদনা
কেবা যাবে পরতীতি।
কানুর পিরিতি ঝুরি দিবারাতি
সদাই চমকে চিতি।।
সই, ছাড়িতে নারিরি কালা।
কুল তেয়াগিয়া ধরম ছাড়িয়া
লইব কলঙ্করে ডালা।।
মাথায় করিয়া দেশে দেশে যাব
মাগিয়া খাইব যবে।
সতী চরচার কুলেরে বিচার
তবে সে আমার হবে।।
চন্ডীদাসে কয় কলঙ্কে কি ভিয়
যে জনা পিরিতি করে।
পিরিতি লাগিয়ে মরমে ঝুলিয়ে
কি তার আপন পরে।।’

পদটিতে কৃষ্ণনুরাগিণী শ্রীরাধার অনুরাগতপ্ত হৃদয়ানুভূতির চিত্র সুস্পষ্ট। রাধা কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন, তাঁকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল। তাঁর নয়নযুগল অশ্রুসজল, দেহমন সদাই পুলকাকুল। শ্যামময় দেখেনে সবকিছুই, যেদিকে তাকান সেদিকেই শ্যামকে দেখেন। যমুনার কালো জল তাঁকে কৃষ্ণের কথা মনে করিয়ে দেয়, আর তাতে তাঁর দেহ মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। কৃষ্ণপ্রেমে তিনি অটল। কোনো বাধাই তাঁকে কৃষ্ণানুরাগ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। প্রয়োজনে কুলধর্ম বিসর্জন দিতেও তাঁর আপত্তি নেই। যদি দেশে দেশে

মাধুকরী করে দিনাতিপাত করতে হয় তাতেও তাঁর আপত্তি নেই বস্তুত গভীর কৃষ্ণানুভক্তিই যে শ্রীমতী রাধাকে সর্বপ্রকার দ্বিধা-সংকোচ ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করছে, তাঁকে দুঃসাহসিক করে তুলছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কবিও তাঁকে সমর্থন করে বলছেন যে, প্রেমের জন্য যে কেঁদে মরে, তার আবার ঘর-দুয়ার ঈশ্বরাভিমুখী করে তুলতে তো হবেই।

‘সই, কে বা শুনাইল শ্যামনাম।

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো

আকুল করিল মোর প্রাণ।।

না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো

বদন ছাড়িতে নাহি পারে।

জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো

কেমনে পাসরিবি তারে।।’

পূর্বরাগ রস-পর্যায়ের এক অতুলনীয় পদ। শ্রীমতি রাধার কৃষ্ণানুরাগের অনুপম চিত্র এখানে অঙ্কিত। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে এখনও দেখেননি, শুধু তাঁর নাম শুনেছেন। আর তাতেই তিনি বিহ্বলা, আত্মহারা। শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনেই তাঁর মন প্রাণ আকুল। নাম শুনেই যদি এরূপ আবস্থা হয়, তাহলে তাকে চাক্ষুষ দেখতে পেলে না জানি কী অবস্থা হবে। তাহলে তাহলে তো রাধার পক্ষে যুবতীধর্ম বজায় রাখাই দায় হবে। আর অঙ্গস্পর্শ ঘটলে তো আর কথাই নেই। রাধার এই চিন্তাও হয় যে তিনি কুলবধূ। তাই কুলধর্ম রক্ষার চিন্তায় তিনি মাঝে মাঝে কৃষ্ণনাম ভুলতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পারেন না, এ এক আদ্ভুত অবস্থা। কোনো উপায় খুঁজে পান না প্রেমোন্মাদিনী রাধা।

পদটির মর্মগ্রাহিতা অনন্যসাধারণ। ব্যঞ্জনা অসাধারণ। রাধার জবানিতে চন্ডীদাস যখন আকুল কন্ঠে বলে ওঠেন, ‘সই, কবো শুনাইল শ্যামনাম’ - তখন সঙ্গে সঙ্গে পাঠকমনও সাড়া দিয়ে ওঠে। শ্যাম নাম বিরহ-ব্যাকুল পাঠকেরও ‘কানের ভিতর দিয়া মরমে’ প্রবেশ করে। এই সার্বজনীন আবেদন সৃষ্টি চন্ডীদাসের অসাধারণ সৃষ্টি ক্ষমতার পরিচয় বাহী।

‘ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার

তিলে তিলে আসি যাও।

মন উচাটন নিশ্বাস সঘন

কদম্ব-কাননে চাও।।

কেন বা এমন হৈলে।

গুরু দুরুজনে ভয় না করিলে

কোথা বা কি দেবে পাইলে।

সদাই চঞ্চল বসন-অঞ্চল

সম্বরণ নাহি কর।

বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি

ভূষণ খসাঞা পর।।

বয়সে কিশোরী রাজার ঝিয়ারী

তাহে কুলবধূ বালা।

কিবা অভিলাষে বাড়ালে লালসে

না বুঝি তোমার ছলা।।

তোমার রচিত অতি বিপরীত

হাত বাড়াইলে চান্দে।

চন্ডীদাস কয় করি অনুনয়

ঠেকিলা কালিয়া ফান্দে।।'

শ্রীরাধার পূর্বরাগের এই পদটিতে শ্রীরাধার ভাবান্তরের কথা সখীদের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ লাভ করেছে। তাদের কথাবার্তায় স্পষ্ট যে শ্রীরাধা কারও প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছেন এবং তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ তা সখীরা না বুঝতে পারলেও আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। শ্রীরাধার অনুরক্তির পরিচয়, ফুটে উঠেছে তাঁর দেহ-মনের চাঞ্চল্যে, উদ্বিগ্নতায়, স্থৈর্যহীনতায়, উদাসীনতায়। তিনি যেন কারও আগমন

প্রতীক্ষায় বারবার ঘর-বার করছেন, কদম্ব কাননের দিকে অনিমেষে নয়নে তাকিয়ে আছেন, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছেন। তাঁর গায়ের অলংকার খোলা-পরা করছেন, বসন অসংবৃত হয়ে পড়ছে। কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর। থেকে থেকেই চমকে উঠছেন। সখীরা এও লক্ষ করছে যে রাধা তাঁর বধূজনোচিত স্বাভাবিক লজ্জা, সংকোচ, ভয়, শালীনতাবোধ সব হারিয়ে ফেলেছেন। তাদের অনুমান রাধা কোনো অসম্ভবকে লাভ করার জন্য হাত বাড়িয়েছেন। কবি চন্ডীদাস রহস্য উন্মোচন করে দিয়েছেন। সখীদের বলছেন - এ অন্য কিছু নয়, 'রাধা ঠকেছে কালিয়া ফাঁদে।'

পদটি অসামান্য কাব্য রসসমৃদ্ধ। পূর্বরাগের লক্ষণগুলি অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠছে শ্রীরাধার আচরণে। হয়ে উঠছে প্রত্যক্ষগম্য। সর্বোপরি, পদটি একদিকে যেমন বাস্তব জীবনরসে পূর্ণ, তেমনই অন্যদিকে আধ্যাত্মিক আবেদন সমৃদ্ধ; লৌকিক ও অলৌকিকের সমন্বয়ে এক অপূর্ব সৃষ্টির মহিমা লাভ করেছে।

অনুরাগ :

বৈষ্ণব পদসাহিত্যে নানা রস পর্যায়ে বিন্যস্ত। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রানুযায়ী সেই সব রসপর্যায়ের অন্যতম প্রধান কয়েকটি হল- পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মিলন, রসোদগার, আক্ষেপানুরাগ, খন্ডিতা, প্রেমবৈচিত্ত্য, মান, মাথুরবিরহ, ভাবসম্মিলন প্রভৃতি।

'অনুরাগ' 'পূর্বরাগে'রই প্রগাঢ়তম অবস্থা। অনুরাগের সংজ্ঞা নির্দেশ করে শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে বলছেন-

'সদানুভূতমপি যঃ কুর্যান্নবনবং প্রিয়ম্।

রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্যতে।।'

অর্থাৎ "যে রাগ নিত্য নবায়মান হয়ে সর্বদা অনুভূত প্রিয়জনকেও নতুন নতুনভাবে অনুভব করিয়ে প্রতি মুহূর্তেই প্রেমকে নবীনতা দান করে তাকেই অনুরাগ বলা হয়।" অনুরাগের লক্ষণগুলি হল - পরস্পর বশী ভাব, প্রেমবৈচিত্ত্য, অপ্রাণীতেও জন্মলাভের উৎকট লালসা এবং বিপ্রলম্ভেও বিস্ফূর্তি অর্থাৎ বিরহাবস্থাতেও কৃষ্ণানুভব। অনুরাগ তিন প্রকার। যথা- রূপানুরাগ, আক্ষেপানুরাগ এবং অভিসারানুরাগ।

বৈষ্ণব পদাবলীতে পূর্বরাগের মতো অনুরাগের পদসংখ্যাও সুপ্রচুর এবং প্রেমের বর্ণবৈচিত্র্য প্রকাশে এগুলির গুরুত্ব কম নয়। বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস প্রমুখ কবিবৃন্দ অপূর্ব সব অনুরাগের পদ রচনার দ্বারা বৈষ্ণবসাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছেন। পদকর্তা চণ্ডীদাস পূর্বরাগের মত অনুরাগ, বিশেষত আক্ষেপানুরাগের পদেও প্রেমগভীরতার যে বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটিয়েছেন, কাব্যইতিহাসে তার তুলনা কমই পাওয়া যায়।

৬.৩। চন্ডীদাসের পদে অভিসার

সাধারণভাবে মলিন কামনায় নায়ক বা নায়িকার সংকেতস্থলে গমনই হল অভিসার। কিন্তু ভক্ত বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে অভিসার ভিন্ন তাৎপর্যে মন্ডিত। তাঁদের দৃষ্টিতে অভিসার হল ঈশ্বর-অন্বেষণ। পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের জন্য জীবাত্মার বিশেষ যাত্রাই অভিসার। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে নায়কের অভিসারের কথা থাকলেও তার তত প্রসিদ্ধি বা ব্যাপকতা লক্ষিত হয় না। পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের অভিসারের কয়েকটি পদ থাকলেও সেখানে শ্রীরাধার অভিসারেরই প্রাধান্য। বৈষ্ণব কবিগণ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলন কামনায় জীবাত্মার প্রতীক শ্রীরাধার অভিসার যাত্রার অপূর্ব সব পদ রচনা করেছেন। অবশ্য অধ্যাত্মতত্ত্ববর্জিত হলেও সেগুলি মানবিক আবেগের স্পন্দনে উজ্জ্বল, বাস্তব জীবনরসে ভরপুর।

অভিসারের সাধনা দুস্তর সাধনা। এ জন্য প্রস্তুতি নিতে হয় সবরকমভাবে যাতে বর্ষার দুর্যোগময়ী রজনী, মেঘগর্জন, কুলিশপতন, অবিরল বর্ষণধারা, কন্টকময় কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথ, গুরুজন ও সমাজ-সংসারের ভ্রুকুটি কোনো কিছুই অভিসার যাত্রায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। অভিসার নানা প্রকার। পীতাম্বর দাস নায়িকার বিভিন্ন প্রকারের অভিসারের বর্ণনা দিয়েছেন। যথা জ্যোৎস্নাভিসার, কুজ্ঝটিকাভিসার, তীর্থাভিসার, উন্মত্তাভিসার, সঞ্চরাভিসার প্রভৃতি। অভিসার রস-পর্যায়ের পদ রচনায় গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব শ্রেষ্ঠত্বের সীমালগ্ন। বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, রাধামোহন ঠাকুর প্রমুখ পদকর্তাগণও অভিসারের পদরচনায় বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। পদকর্তা চন্ডীদাস বিরচিত অভিসার পদটি হল-

‘এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা

বন্ধু, কেমনে আইলে বাটে।

আঙ্গিনার কোণে গোখানি তিতিঞ্জিাছে

দেখিয়া পরাণ ফাটে।।

সই, কি আর বলিব তোরে।

কোন পুণ্যফলে সে হেনে বন্ধুয়া

আসিয়া মিলিল মোরে।।

ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ

বিলম্বে বাহির হলুঁ।

আহা মরি মরি সঙ্কেতে করিয়া

কত না যন্ত্রণা দিলুঁ।।

বন্ধু পিরিতি আরতি দেখিয়া

মোর মনে হেনে করে।

কলঙ্করে ডালি মাথায় করিয়া

আনল ভেজোই ঘরে।।

আপনার দুখ সুখ করি মানে

আমার দুখেরে দুখী।

চন্ডীদাস কহে বন্ধুর পিরিতি

শুনিয়া জগত সুখী।।’

পদটিতে অভিসার যাত্রার বর্ণনা নয়, বর্ণিত হয়েছে অভিসার যাত্রায় বিলম্ব ঘটায় শ্রীরাধার নিদারুণ মর্মযন্ত্রণার কথা। ঘন দুর্যোগময়ী রজনীতে অবিরাম বর্ষণধারায় সিক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ সংকেতকুঞ্জে পৌঁছে অধীর অপেক্ষায় আছেন শ্রীরাধার আগমন প্রত্যাশায়। বিলম্বে আগতা শ্রীমতী

রাধা শ্রীকৃষ্ণের সেই সর্বাঙ্গসিক্ত অবস্থা দর্শনে যুগপ□ দুঃখ ও আনন্দে তাপিতা ও আহ্লাদিতা। দুঃখ এজন্য যে অভিসার যাত্রায় রাধার বিলম্ব ঘটায় শ্রীকৃষ্ণের মতো প্রেমিক কষ্টভোগ করছেন বলে। আর আনন্দ তাঁর প্রতি কৃষ্ণের গভীর ভালোবাসার পরিচয় পেয়ে। সেই পরম প্রেমময়ের গভীর প্রীতি ও মমতায় আপ্লুত হয়ে রাধার মনে হয়েছে – 'কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া আনল ভেজাই ঘরে।' কৃষ্ণের গভীর ভালোবাসা আজ রাধাকে ঘর-সংসারের প্রতি বিমুখ করে তুলেছে, গৃহসুখ নয়, বন্ধুর প্রীতিই তার পরম কাম্যবস্তু হয়ে উঠেছে।

পদটিতে রাধা-হৃদয়ের সুগভীর প্রেমোনুভূতির অপরূপ প্রকাশ ঘটেছে সহজ ভাষায়, অনুপম বাণীবিন্যাসে। প্রকাশভঙ্গি নয়, ভাবের ঐশ্বর্যই পদটিতে প্রধান হয়ে উঠেছে। অল্প কথায়, সহজ সরল ভাষায় গভীর ভাব প্রকাশে চন্ডীদাস যে কী পরিমাণ কৃতবিদ্য, পদটি তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

৬.৪। চন্ডীদাসের পদে বাসকসজ্জা

প্রিয়তম নায়ক আসবেন কুঞ্জে। মিলিত হবেন নায়িকার সঙ্গে। তার জন্য প্রয়োজন প্রস্তুতির। প্রস্তুতি নেবেন নায়িকা সর্বতোভাবে। কুঞ্জ সাজাবেন, নায়কের অভিলাষ অনুযায়ী সজ্জিত হবেন নিজে। মিলনোদ্দীপক এই কুঞ্জসজ্জা বাসকসজ্জা, আর যে নায়িকা কর্তৃক এই সজ্জা-রচনা, যিনি কুঞ্জকুটির সাজিয়ে ও নিজে সজ্জিতা হয়ে নায়কের আগমন প্রত্যাশায় প্রহর গোনেন তিনি বাসকসজ্জিতা। কুঞ্জ সাজিয়ে তিনি অনিমিষে নয়নে তাকিয়ে থাকেন পথ পানে, সখীদের সঙ্গে নিরত থাকেন মধুর আলাপনে। মনে মনে বয়ন করেন স্বপ্নের জাল। আবার কখনও নৈরাশ্য কখনও ক্ষোভ ও রোষ, কখনও অভিমান ও বেদনা দানা বাঁধে তাঁর কুসুমকোমল অন্তরে - বিশেষত প্রতীক্ষা ব্যর্থ হলে। চন্ডীদাস রচিত বাসকসজ্জার একটি পদটি হল -

'দুয়ারের আগে ফুলের বাগান

কসিরে লাগিয়া কলুঁ।

মধু খাই খাই ভ্রমর মাতল

বিরহ জ্বালায় মলুঁ।।

জুই রুইনু জাই রুইনু

রুইলুঁ গন্ধ মালতী।

ফুলরে বাসে নদি না আসে

পুরুষ নঠিুর জাতী।।

কুসুম তুলয়িা বে·াঁটা তয়োগয়িা

শজে বছিাইনু কনে।

যদি শুই তায় কাঁটা ভুঁকে গায়

রসকি নগর বনি।।

পদটতিে বাসকসজ্জতিা শ্রীমতী রাধার গভীর অন্তর্বদেনার মর্মস্পর্শী প্রকাশ ঘটছে। সুখশয্যা কন্টকশয্যায় পরণিত হলে হৃদয় বদীর্ণ তে·া হবইে; দীর্ঘ প্রতীক্ষা বফিল হলে, সর্বে·াপরি নারীসত্তা উপক্ষেতি হলে তার চে·াখরে জলে পৃথবিী ভাসবে এটাই তে·া স্বাভাবকি। কবি চন্ডীদাস পরম সহানুভূতরি সঙ্গে বাসকসজ্জতিা রাধার মর্মযন্ত্রণাকে প্রাণরে অক্ষরে ফুটয়িে তুলছেনে উল্লখেতি পদটরি আধার। শ্রীমতী রাধার নরিুদ্ধ ক্রন্দন মলিনকুঞ্জরে লতা-পাতাকওে আর্ত করে তুলছে।

৬.৫। চন্ডীদাসরে পদে মান

প্রমেরে গতি বচিত্রি। বচিত্র তার রূপ ও স্বরূপ। কখনও তা ঋজু, কখনও বা বক্রগতি। কখনও তা সরল, কখনও বা জটলি। কখনও তা শ্বতেশুভ্র, কখনও আবার রক্তরঞ্জতি। ক্ষণে ক্ষণে তা রূপ বদলায়। নায়ক-নায়কিার চত্তিে বভ্রিান্তি ঘটায়। ফলত, ঘন প্রমেওে জটলি মুহূর্ত আস, কারণে অকারণে সন্দহে দানা বাঁধ, ঘনীভূত হয় সমস্যা। নায়করে প্রতি নায়কিার সন্দহে জাগে নায়ক বুঝি বা অন্য নায়কিায় আসক্ত। অভমিাননিী নায়কিা-হৃদয় বক্রিুব্ধ হয়, হয়ে ওঠে মলিনবমিুখ। নায়করে প্রতি নায়কিার এই বমিুখতার নাম মান।

মান দুই প্রকার - সহতেু মান এবং অহতেুকী মান। যখোনে নায়কিার কুঞ্জসজ্জা ব্যর্থ, রাত্ররি প্রহরগুলি কুসুমরে মত ঝরে পড়ে, ব্যর্থতার হাহাকারে নায়কিা দীর্ঘশ্বাস ছাড়, নশিি অবসানে ভন্নি নায়কিার সম্ভে·াগচহ্নি ধারণ করে নায়ক এসে দাঁড়ান ব্যর্থ প্রতনিায়কিার কুঞ্জ,

তখন ক্ষুব্ধ নায়িকার মান সহেতুমান। সকারণ বলে সেই মান দুর্জয় মান। অন্যদিকে অহেতুকী মান-এ কোন কারণ থাকে না; প্রেমের গভীরতা বা আধিক্যই মান সৃষ্টি করে। তবে এ মান দুর্জয় নয়। তা যেমন অকারণে সৃষ্ট হয়, তেমনি অকারণেই ভেঙে যায়। অহেতু মান অনেকাংশেই সাময়িক রতি কলহ মাত্র। সহেতু মানে মানিনী নায়িকার মনে প্রতিনায়িকার প্রতি ঈর্ষা জাগে, নায়কের প্রতি জমা হয় অভিমানের দুর্জয় পাহাড়; মুখর অভিযোগে হয় প্রগলভা; তখন নায়িকা খণ্ডিতা। রসশাস্ত্রে খণ্ডিতা নায়িকারও আট প্রকার অবস্থার কথা আছে। তা হল - নিন্দয়া, ক্রোধা, ভয়ানকা, প্রগলভা, মধ্যা, মুগ্ধা, কম্পিতা ও সন্তপ্তা। মান-এর সূচনা জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ’-এ। পদাবলীতে সে ধারা বিস্তৃতি লাভ করে। চন্ডীদাসও অভিমানিনী রাধার অপূর্ব রূপচিত্র অঙ্কন করেছেন। তবে বিশুদ্ধা মানিনীর ছবি চন্ডীদাসে বিশেষ লক্ষিত হয় না। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ সাহা তাঁর ‘বৈষ্ণব পদাবলী : পদ ও পদকার’ গ্রন্থে বলেছেন- “দুর্জয় মান চন্ডীদাসের রাধার ক্ষেত্রে একটু বেমানান। কারণ প্রিয়জনকে প্রত্যাখ্যান করতে গেলে প্রতি শিরা-উপশিরায় তীব্র টান পড়ে। তবে অভিমানিনীর খণ্ডিতা রূপকে চন্ডীদাস অপরূপ করে এঁকেছেন। এগুলিতে রোষ ও জ্বালার সঙ্গে অশ্রুজল টলটল করে একপাত্রে। এগুলি বেদনা ও ব্যঙ্গের মিলিত রূপ।” চোখের জলে ভাসতে ভাসতে শ্রীমতী রাধা বলেছেন -

‘সই, কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙিনা দিয়া।।
সে হেন কালিয়া না চাহে ফিরিয়া
এমতি করিল যে।
আমার অন্তর যেমতি করিছে
সেমতি হউক সে।।
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু
লোকে অপযশ কয়।

সে যে গুণনিধি   পীরিতি অবধি

আর কার জানি হয়।।

আপনা আপনি   মন বুঝাইলে

পরতীত নাহি হয়।

পরেরে পরাণ   রতন হরিলে

কার বা পরাণে সয়।।

কি যোগ করিয়া   শ্যাম ভাঙ্গাইয়া

এমন করিল কে।

আমার পরাণ   যেমন পুড়িছে

তেমতি পুড়ুক সে।।

কহে চন্ডীদাস   করহ বিশ্বাস

সে শুনি উত্তম মুখে।

কে বা কোথা ভাল   আছয়ে সুন্দরী

দিয়া পর মন দুখে।।’

চন্ডীদাসের রাধা স্বভাব-কোমল ভীরু নায়িকা। তিনি মমতাময়ী, এমন কি ‘খণ্ডিতা’ পর্যায়ের পদেও তাঁর সেই অমলিন স্নেহময়ী রূপ। তাই তো দেখা যায় নিষ্ঠুর নায়ক এবং প্রতি নায়িকার প্রতিও তিনি দুর্ভাষা প্রয়োগ করতে পারেন না। তাই তো চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাত্রি যাপনান্তে কৃষ্ণ তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালে ঈষৎ ব্যঙ্গ ভাষণে শুধু বলেন-

‘ছল ছল আঁখি দেখে মনে ব্যথা পাই।

কাছে বস আঁচলেতে মুখখানি মুছাই।।’

তাই তো প্রিয়তম তাঁকে উপেক্ষা করে অন্য নারীতে আসক্ত হলে সখীর কাছে নিদারুণ দুঃখার্তি প্রকাশ করে বলেন -

‘সই কেমনে ধরিব হিয়া।

আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়

আমার আঙনিা দয়িা।'

মাননিী নায়কিার অন্তরে প্রতনিায়কিার প্রতি ক্রোধ, ঈর্ষা জাগা স্বাভাবকি। কনি্তু চন্ডীদাসরে মাননিী রাধা প্রতনিায়কিার প্রতি ক্রোধ প্রকাশরে ক্ষত্রেওে যনে কুন্ঠতিা। তাই তনিি প্রমেরে প্রতদ্বিন্দ্বনিীর প্রতি অভশিাপ বর্ষণ করতে গয়িে শুধু বলনে -

'যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙাইয়া এমত করলি যে।

আমার পরাণ যমেতি করছি তমেতি হউক সে।।"

এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেনে - "শত সহস্র অভশিাপরে পরবির্তে সে কবেল একটি কথা কহলি। সে কহলি, "আমার পরাণ যমেন করছি, তমেতি হউক সে!"..... ঐ এক 'যমেন করছি' শব্দরে মধ্যে নদিারুণ কষ্ট, প্রচ্ছন্ন আছ, সে কষ্ট বর্ণনা না করলিে যতটা বর্ণতি হয় এমন আর কছিুতে না। উপরউিক্ত পদটরি মধ্যে রাধা দুইবার অভশিাপ দতিে গয়িাছে কনি্তু উহার অপক্ষো গুরুতর অভশিাপ সে আর কোনমতে খুঁজয়িা পাইল না।" বস্তুত চন্ডীদাসরে রাধা নদিারুণ দুঃখাভঘিাতে যমেন শান্ত সমাহতিা, ক্রোধ প্রকাশরে ক্ষত্রেওে তমেনি শালীনতাময়ী, সংযতভাষণিী। এখানইে চন্ডীদাসরে অনন্যতা।

৬.৬। চন্ডীদাসরে পদে প্রমেবচৈত্যি

বষ্ণৈব সাহত্যিে প্রমেবচৈত্যি বশিষ্টি একটি রস পর্যায়। প্রমেবচৈত্যি শব্দটরি আক্ষরকি অর্থ প্রমেরে জন্য চত্তিরে ব্যাকুলতা বা বহ্বিলতা। রূপ গোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে প্রমেবচৈত্যিরে সংজ্ঞা নর্দিশে করতে গয়িে বলছেনে-

'প্রয়িস্য সন্নকির্ষহেপি প্রমেোৎকর্ষ স্বভাবতঃ।

যা বশ্লিষেধয়িাত্তস্তিং প্রমেবচৈত্যিমুচ্যতে।।'

অর্থাৎ প্রমেরে স্বাভাবকি উৎকর্ষতাবশত প্রয়ি সন্নকিটে থকেওে বশ্লিষ্টি হবার যে বদেনা তারই আস্বাদনযোগ্য অবস্থার নাম প্রমেবচৈত্যি। প্রমেরে এ এক বচিত্রি স্বভাব। শ্রীরাধা যখন শ্রীকৃষ্ণরে

বক্ষলগ্ন হয়ে আছেন, সেই মিলনমুহূর্তেও ভবিষ্যতের কোন বিচ্ছেদ আশঙ্কায় তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন। এই প্রেমবৈচিত্ত্যের সূচনা বিদ্যাপতির পদাবলীতে যেখানে শ্রীরাধা বলছেন-

'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ,

তবু হিয়া জুড়ন না গেল ।'

পরবর্তী বহু বিশিষ্ট পদকর্তা প্রেমবৈচিত্ত্যের মূল্যবান পদ রচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন চন্ডীদাস, গোবিন্দদাস, বল্লভদাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস প্রমুখ পদকর্তা। চন্ডীদাসের

'এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি।

পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা আপনি।।'

প্রেমবৈচিত্ত্য রস পর্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য পদ-নিদর্শন। পদটিতে দেখি, রাধাকৃষ্ণ পরস্পর পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ, কিন্তু সেই মিলনমুহূর্তেও তাঁরা অশ্রুসাগরে ভাসছেন বিচ্ছেদের আশঙ্কায়। এ যেন আঁচলে বাঁধা সোনা, তবু মনে হয় যেন- 'কে নিল কে নিল?' এই যে পরস্পর পরস্পরের নিবিড় নৈকট্যে থেকেও বিরহের ব্যাকুলতা, এটিই প্রেমবৈচিত্ত্য।

'এমন পিরিতি কভু দেখি নাহি শুনি।

নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি।'

'পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর ভুবনে আনিল কে।' এবং 'কাল জল ঢালিতে কালিয়া পড়ে মনে।'

১. 'এমন পিরিতি কভু দেখি নাহি শুনি।

নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি।।

সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।

মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা।

এক তনু হৈয়া মোরা রজনী গোঙাই।

সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই।

রজনী প্রভাত হলে কাতর হিয়ায়।

দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায়।

সে কথা কহিতে সই বিদরে পরাণ।

চন্ডীদাস কহে ধনি সব পরমাণ।।’

২. পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর

আর না বলিবি মুখে।

শ্যামের সঙ্গে পিরিতি করিয়া

জনম গোঙালুঁ দুখে।।

সখি, এ বড় মরম ছিল।

আমি ত অবলা কুলবতী বালা

তিনি তার সঙ্গে গেলে।।

আগে না জানিয়া পাছে না গণিয়া

পিরিতি মনের সাধে।

বিধি সে লাগিল বাদে।।

পতি গুরুজন বোলে কুবচন

ঘরে মন নাহি বাঁধে।

চন্ডীদাস কহে বিরহে আকুল

ঠেকিলা কালিয়া ফাঁদে।।’

উল্লিখিত প্রেমবৈচিত্ত্যের পদদুটিতে মিলন-মদির আনন্দানুভূতির মাঝেও রাধা-হৃদয়ের বিরহার্তির প্রকাশ ঘটেছে। প্রেমের মধ্যেও পড়েছে বুক নিংড়ানো, প্রাণ নিংড়ানো যন্ত্রণাময় অতৃপ্তির ছায়া। গভীর কৃষ্ণ-প্রেমে নিমজ্জিত হওয়ার পরই শ্রীমতী অনুভব করছেন পিরিতির অসহনীয় জ্বালা। গভীর মিলন সুখানুভূতির তির মাঝেও বিচ্ছেদের আশঙ্কায় আতঙ্কিতা হয়ে

উঠছে রাধা-হৃদয়। মিলনোত্তর অনুভবের পুলক ব্যক্ত করতে গিয়ে রাধা বলেন-

‘এমন পিরিতি কভু দেখি নাই শুনি।

নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি।।’

প্রেমের স্বভাবই এই। নিবিড় নৈকট্যে থেকেও কাছের মানুষকে দূরের মনে হয়, নিমেষের বিচ্ছেদকে মনে হয় যুগ-যুগান্তরের। বেদনা কাতর চিত্তে রাধা তাই বলছেন-

‘একতনু হয়ো মোরা রজনী গোঙাই।

সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই।

রজনী প্রভাত হলে কাতর হিয়ায়।

দহে ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায়।।’

এই-ই তো প্রেমের উ□কর্ষতাজনিত বিচ্ছেদকাতরতার আর্তি, এই-ই হল প্রেমচৈতন্য। সরল ভাবসান্দ্র ভাষায় চণ্ডীদাস রাধা-হৃদয়ের আর্তি ও চিত্তব্যাকুলতার মর্মস্পর্শী ছবি এঁকেছেন, বেদনাঘন প্রেম-মাধুরীকে সুগভীর ব্যঞ্জনায় নিত্যকালের প্রেমকাব্যের মহনীয়তা দান করেছেন।

৬.৭। চন্ডীদাসের পদে আক্ষেপানুরাগ

হৃদয় প্রত্যাশা করে আর একটি হৃদয়, মন আর একটি মনের নৈকট্য চায়, প্রেমে প্রত্যাশা করে প্রেমের। এই প্রত্যাশার অপূর্ণতায় আসে আক্ষেপ। যখন সব দিকে প্রিয়জনের কাছে যথাযথ প্রতিদান পাওয়া যায় না তখন অন্তরে জাগে আক্ষেপ। কৃষ্ণে সমর্পিত প্রাণা রাধার অন্তরেও জাগে আক্ষেপ। তবে তিনি কৃষ্ণানুরাগিণী বলে তাঁর আক্ষেপ আক্ষেপানুরাগ। আক্ষেপানুরাগ প্রসঙ্গে শঙ্করীপ্রসাদ বসু মহাশয় তাঁর ‘চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি’ - গ্রন্থে বলছেন- “প্রত্যাশার অপূরণ-জনিত ক্ষোভ ইহার বিষয়বস্তু। অহেতুক প্রেমের প্রেমই একমাত্র প্রত্যাশা। কিন্তু প্রেম বিশুদ্ধ হৃদয়বৃত্তি হইলেও এ হৃদয় দেহাধারে ধৃত, সমাজপীঠে স্থাপিত, বিভিন্ন চরিত্রের দ্বারা বেষ্টিত। প্রেমকে প্রকাশ করিতে গেলে তাই

সর্বপ্রকার আধার সহিত প্রকাশ করিতে হয়। আক্ষেপানুরাগে রাধিকার প্রেমনৈরাশ্য বর্ণিত, এ নৈরাশ্য অবশ্যই পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংঘর্ষের ফল। একদিকে আছে রাধিকার অসংবৃত অপরিণামদর্শী অন্তর ও প্রবঞ্চক প্রেমিক; অন্যদিকে বিরূপ সমাজ। ইহাদের সকলের বিরুদ্ধে রাধার আক্ষেপ। সেই আক্ষেপকে নানাভাগে ভাগ করা হইয়াছে। সঙ্কলকদের মতানুসারে সেগুলি যথাক্রমে - প্রিয়-সম্বোধনে, বংশী নিন্দনে, স্বগত-কথনে, সখী সম্বোধন, দূতী সম্বোধনে, বিধাতৃ-নিন্দনে, পিরীতি-গঞ্জনে, গুরুজন-নিন্দনে।”

আক্ষেপানুরাগের ব্যাখ্যা করে রামগোপাল দাস বলেছেন -

‘আক্ষেপানুরাগ উক্তি নানাবিধ হয়ে।
দিগদরশন লাগি কিঞ্চিৎ কহিয়ে।।
কৃষ্ণকে আক্ষেপে করে আর মুরলীকে।
দূতীকে আক্ষেপে করে আর যে সখীকে।।
গুরুজনে আক্ষেপে আর কুলশীল জাতি।
আপনারে নিন্দে কভু দৈন্যভাব গতি।।
কন্দর্পেরে মন্দ বলে করিয়া ভৎসনা।
বিপক্ষাদির ব্যঞ্জিয়া কভু করয়ে বঞ্চনা।।
বিধাতাকে নন্দ বলে কড়ু দৈবে রোষে।’

অর্থাৎ আক্ষেপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, মুরলীর প্রতি, দূতীর প্রতি, সখীর প্রতি, গুরুজনের প্রতি, নিজের কুলশীল জাতির প্রতি, কন্দর্পের প্রতি এবং বিধাতার প্রতি।

অনেকে প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগকে এক বলে মনে করেন। আসলে কিন্তু তা নয়। বলা যেতে পারে আক্ষেপানুরাগ প্রেমবৈচিত্ত্যের একটি দিক। প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেছেন – “অনুরাগের আধিক্যে অনুপস্থিত প্রিয়, স্বজন অথবা নিজেকে নিয়ে আক্ষেপ করাকে আক্ষেপানুরাগ বলা হয়। এখানে লক্ষণীয় ‘আক্ষেপানুরাগে’ নায়ক থাকেন অনুপস্থিত, পক্ষান্তরে,

'প্রমেবচৈত্তি্যে' নায়ক থাকনে নায়কিার নকিটইে অবস্থতি। আবার 'আক্ষপোনুরাগে' অনুয◌োগরে ভাবটাই প্রবল, কন্তিু প্রমেবচৈত্তি্যে বরিহরে আশঙ্কাই প্রকাশতি।" আবার, প্রমেবচৈত্তি্যে রাধা-কৃষ্ণ ঘনষ্ঠি মলিনরে মধ্যওে বরিহকাতরতা অনুভব করনে অন্যদকিে আক্ষপোনুরাগে লক্ষ করা যায় স্থায়ী দুঃখকাতরতা। এই দুঃখ যহেতেু রাধার অনুভবরে ব্যাপার, তাই এর শষে নইে। রাধার সইে অন্তর্বদেনার প্রকাশ বষ্ণৈব কাব্যে অসাধারণ শল্পিরূপ লাভ করছে।

আক্ষপোনুরাগরে শ্রষ্ঠে কবি চণ্ডীদাস। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর ভাষায়- "চন্ডীদাসরে সর্বস্ব আক্ষপোনুরাগ এবং আক্ষপোনুরাণরে সর্বস্ব চন্ডীদাস।" আক্ষপোনুরাগ পর্যায়রে পদ রচনাতইে চন্ডীদাসরে প্রতভিার চরম বকিাশ। রাধার মর্মবদেনাকে পরম সহানুভূতরি সঙ্গে চন্ডীদাস ফুটয়িে তুলছেনে অনুপম দক্ষতায়। একদকিে কৃষ্ণপ্রমেরে বহমুখী আকর্ষণ, অন্যদকিে অন্তঃপুররে পরজিন-প্রীতি ও সংস্কার - এই দুই-এর দ্বন্দ্বে ক্ষতবক্ষিত রাধার অন্তর্বদেনা ফুটে উঠছে তাঁর আক্ষপোনুরাগরে পদগুলতিে।

'এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।

না জানি কানুর প্রমে তলিে জানি টুটে।।

গড়ন ভাঙ্গতিে সই আছে কত খল।

ভাঙ্গয়িা গড়তিে পারে সে বড় বরিল।।

যথা তথা যাই আমি যত দুখ পাই।

চাঁদ মুখরে মধুর হাসি তলিকে জুড়াই।

হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়।।

চণ্ডীদাস কহে রাই ভাবছি অনকে।

ত◌োমার পরিতি বিনিে না জয়িে তলিকে।।'

পদটতিে শ্রীরাধার প্রমেযন্ত্রণার কথা সহজ অথচ আবগেবাহী ভাষায় প্রকাশতি হয়ছে। পদটতিে আক্ষপেরে ভতির দয়িে কৃষ্ণপ্রমেরে গভীর

তা□পর্য ফুটে উঠেছে। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার পদটির অতুল্যতা স্বীকার করে প্রশংসা করেছেন। পদটির মূল্যায়ন করে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেছেন - "নিজস্বভাবে রাধা একটি মহাসত্য বলিয়াছেন- ধ্বংসের শক্তিই সুলভ, সৃষ্টিশক্তি বিরল। প্রেমে বড় সুকুমার; অনেকে অঞ্চলের আশ্রয়ে, হৃদয়ের লালনে, তাহাকে রক্ষা করিতে হয় - তাহার স্বভাব 'তিলে জনি টুটে'। এ হেন প্রেমের ধ্বংসকারীরা। মধুরের শত্রু, সুন্দরের সংহারক, সুতরাং বিশ্বিছন্দের বিনাশক। ইহারা যে কোনো অভিশাপের যোগ্য।

রাধিকা বিশ্বসত্যকে যেমন নিজের বিশেষ মানবিক অবস্থার রঙ দিয়াছেন, তাঁহার অভিশাপের ভাষাও একেবারে তাঁহারই নিজস্ব - "হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়।" কামমোহিত ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চীর একটিকে মারিয়া আদি কবির শাপে নিষাদ মানবমন হইতে শাশ্বতকালের জন্য ভ্রষ্ট হইয়াছিল। রাধিকার শেষ ভরসা, জগতে নিষাদবৃত্তি হয়ত কিছু কমিয়াছে, হয়ত 'নারী অবলার বধ লাগে তায়'- এর মতো দিব্য দিবার পরে, খলেরা যত বড় খলই হউক, সত্যই প্রেমমোহিত রাধিকাকে বধ করিবে না।" বস্তুত, 'হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়' উক্তিটির মধ্য দিয়ে সরলহৃদয়া নারী রাধার অন্তররূপের অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে।

'সই, কহিতে বাসিয়ে ডর।

যাহার লাগিয়া সব তেয়োগিলুঁ

সে কেনে বাসয়ে পর।।

সুজন কুজন যে জন না জানে

তাহারে বলিবি কি।

অন্তর মরম যে জন জানয়ে

পরাণ বাঁটিয়া দি।।

কানুর পিরিতি বলিতে বলিতে

পরাণ ফাটিয়া উঠে।

শঙ্খ-বণিকের যেমতি করাতি

আসতে যাইতে কাটে।।’

পদটিতে শ্রীরাধার প্রেমযন্ত্রণার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা সহজ সরল অথচ গভীর আবেগবাহী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। গভীর মর্মযন্ত্রণার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুযোগ প্রকাশ করে রাধা বলছেন, যাঁর জন্য তিনি সব কিছু বিসর্জন দিয়েছেন, তিনি আজ তাঁর প্রতি বিমুখ কেন তা বুঝে উঠতে পারছেন না। আজ রাধার উভয় সংকট উপস্থিত। প্রেম আজ তাঁর কাছে বেদনা-দায়ক হয়ে উঠেছে। আজ তাঁর মনে হয়েছে, বিচার-বিবেচনা করে অগ্র-পশ্চা□ ভেবে তবেই প্রেমের পথে পা বাড়ানো উচিত ছিল। তা না করার কারণেই আজ তাঁর দুঃখভোগ। কবি তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বলছেন শ্যাম-প্রেমের প্রকৃতিই তো এই। দুঃখ দহনে পরিশুদ্ধ না হলে তো তাঁকে পাওয়া যায় না। শুধু রাধা নন, যিনিই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন তাঁকেই ভোগ করতে হয়েছে নিরতিশয় যন্ত্রণা। কবি যেন বলতে চেয়েছেন অভীষ্টকে লাভ করতে হলে দুঃখের অনলেই পরিশুদ্ধ হতে হবে।

‘পিরিতি পিরিতি এ দুই বচন

কে বলে পিরিতি ভাল।

হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিয়া

জনম কাঁদিতে গেল।।

সই লো, এ বুকে দারুণ ব্যথা।

সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি

পাপ পিরিতির কথা।।’

পদটিতে শ্রীমতী রাধার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে সকরুণ আক্ষেপোক্তি। তিনি পরমানন্দে কৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণ করেছিলেন, তাঁকে ভালোবেসেছিলেন একান্তভাবে। কিন্তু সেই প্রেমের প্রতিদান তিনি পাননি, তাই অনাদর আর উপেক্ষায় তাঁকে চোখের জল ফেলতে হয়েছে সারা জীবন। তাঁর বুকে তাই নিদারুণ যন্ত্রণা, যন্ত্রণাদগ্ধ হচ্ছেন দিবারাত্রি। এখন তিনি প্রেমের প্রতি চরম বিতৃষ্ণ। তাই এমন দেশে তিনি চলে যেতে চান, যেখানে ‘পাপ পিরিতি’-র কথা তাঁকে শুনতে হবে না। তাঁর মতো অভাগিনীকে আর চোখের জল

ফলেতে হবে না। বস্তুত, পদটতিে রাধার সুগভীর কৃষ্ণপ্রমে এবং হৃদয়রে বঞ্চনা জনতি বদেনা মৃদু কণ্ঠে গভীরভাবে প্রকাশ লাভ করছে। চন্ডীদাস যে সহজতম ভাষায় মহত্তম আবগে প্রকাশরে নপিুণ কবি, পদটি তাঁর উজ্জ্বল নদিরশন।

‘ সুখরে লাগয়িা পরিতি করলিুঁ

শ্যাম বন্ধুয়ার সনে।

পরণিামে এত দুখ হবে বল্যা

কে·ান্ অভাগনিী জানে।।

সই, পরিতি বষিম মানি।

এত সুখে এত দুখ হবে বল্যা

স্বপনে নাহকি জানি।।

সে হনে কালয়িা নঠিুর হইঞা

কি শলে লাগলি যনে।

দরশন লাগি যনে হলৈ যুগি

সে এত নঠিুর কনে।।’

শ্রীরাধার অন্তর্বদেনা অপূর্ব শল্পি রূপ লাভ করছে আক্ষপোনুরাগরে এই পদটতিে। শ্রীরাধার প্রমেযন্ত্রণার মর্মান্তকি অভজি্ঞতা সহজ সরল অথচ আবগেস্পন্দতি ভাষায় প্রকাশতি হয়ছে এখান।ে রাধা বলছেনে য,ে তনিি সুখরে প্রত্যাশায় শ্রীকৃষ্ণরে সঙ্গে প্রমেরে বন্ধনে আবদ্ধ হয়ছেলিনে কন্তিু তার পরণিাম যে এমন মর্মবদিারী হবে তা তনিি ভাবতওে পারনেন।ি যে সুখ তনিি পয়েছেনে, তা যে এমন দুঃখদায়ক হবে তা কল্পানা করনেন।ি দগ্ধ প্রাণ শীতল হবে কি করে তা ভবেে শ্রীমতী অস্থরি। অবশ্য কবি চন্ডীদাস তাঁকে সান্ত্বনা দয়িে বলছেনে দুশ্চন্তিতি হওয়ার কারণ নইে; কনেনা তনিি কৃষ্ণরে একান্ত আপন, কৃষ্ণও তাঁরই।

‘যত নবিারয়িে তায় নবিার না যায় রে।

আন পথে যাইতে সে কানু-পথে ধায় রে।।

এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।

যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে।।

এ ছার নাসিকা মুঞি যত করি বন্ধ।

তভু ত দারুণ নাসা পায় শ্যামগন্ধ।।'

কৃষ্ণ যে রাধার ধ্যান-জ্ঞান, কৃষ্ণ যে রাধার সর্বস্ব, রাধার সকল ইন্দ্রিয় জুড়ে যে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান- পদটির মর্মবস্তু তাই। রাধা মুখে যাই বলুন না কেন, তাঁর মনের মধ্যে জীবন্ত যে কৃষ্ণপ্রেম, তাকে এড়ানোর ক্ষমতা তাঁর নেই। রাধার সেই গাঢ় কৃষ্ণানুরাগের কথা জানেন চন্ডীদাস। তাই তিনি রাধাকে বলেন 'মনের মরম কথা কারে নাহি পুছ।' পদটির সুন্দর বিশ্লেষণ করে সনাতন গোস্বামী তাঁর সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' গ্রন্থে লিখেছেন-"চন্ডীদাস রচিত আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ভুক্ত এই পদটিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার আপাতবিরোধের অন্তরালে সুগুপ্ত নিগূঢ় অনুরাগের সুর অনুরণিত হয়েছে। আক্ষেপানুরাগ কথাটির তা□পর্য তো তাই। এখানে কৃষ্ণের প্রতি বিরাগ ভাবের মাধ্যমে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর অনুরাগের অনুভূতিই প্রকাশ পেয়েছে। রাধা কৃষ্ণপথ থেকে নিজ চিত্তকে সরিয়ে নিতে চাইলেও চিত্ত তাঁর কথা শোনে না। তাঁর নাসিকাও রাধার নিষেধে অগ্রাহ্য করে শ্যামের সৌরভ পায়। কান বন্ধ করে রাখলেও সে যেখানে কৃষ্ণপ্রসঙ্গ আলোচিত হয়, সেদিকে মনোযোগ দেয়। রাধা তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে ধিক্কার দেন। কারণ তারাই রাধার অন্তরে সর্বদাই কোনো না কোনো ভাবে কৃষ্ণানুভব সংঘটিত করছে। বস্তুত, কৃষ্ণই রাধার ধ্যানজ্ঞান, কৃষ্ণই তাঁর সবকিছু। তাঁর দেহমন সর্বদাই কৃষ্ণের জন্য উন্মুখ। সেই অনুরাগের সুরটিই শ্রীরাধিকা অনুপমভাবে প্রকাশ করেছেন।"

'দিবস রজনী গুণ গণি গণি

কি হৈলে অন্তরে ব্যথা।

খলের বচনে পাতিয়া শ্রবণে

খাইলুঁ আপন মাথা।।

সই, কে বলে পিরিতি ভাল

হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিলুঁ

কান্দিতে জনম গেল।।

ক্ষীরের গাগরি মুখে বিষ পুরি

অবলা বালাকে দিল।

স্বাোয়াদ পাইয়া খাইতে খাইতে

নিকট মরণ হৈল।।’

আক্ষেপানুরাগের এই পদটিতেও রাধার প্রেমযন্ত্রণার দুঃখময় অভিজ্ঞতা সহস্র অথচ আবেগবাহী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। পদটির সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়ে বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন - “রাধা আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে, রাতদিন দয়িতের গুণের কথা স্মরণ করিতে করিতে তাহার অন্তরে ব্যথা জন্মিল। প্রবঞ্চকের কথা শুনিয়া তিনি নিজের মাথা নিজেই খাইলেন। লোকে বলে প্রেম ভালো, কিন্তু রাধার খুবই ভালো লাগে- মনে হয় যেন ক্ষীরের কলসী, কিন্তু সত্য সত্য উহাতে বিষ মেশানো আছে। প্রথমটায় উহা খাইতে সুস্বাদু লাগিল, কিন্তু শেষে বিষের প্রতিক্রিয়ায় মৃত্যু হইল। তৃষ্ণায় আকুল হইয়া হরিণী যেমন জল খাইতে যায়, আর ব্যাধ তাহার বুকে বাণ মারে, রাধার বুকেও তেমনি কৃষ্ণ মারিয়াছেন। পুটি মাছকে যেমন আহারের লোভ দেখাইয়া বড়শিতে মারিয়া ফেলা হয়, রাধাকেও তেমনি ভালবাসার লোভ দেখাইয়া মারা হইয়াছে। ভালবাসা যেন বিষমিশ্রিত নাড়ু। নূতন মেঘ দেখিয়া তৃষ্ণায় চাতকী হা করিলে পবন যেন মেঘ উড়াইয়া লইয়া গেল। চাতকী বজ্রের আঘাতে মারা পড়িল। কৃষ্ণের প্রেম যেন লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রার তুল্য। উহা পাইয়া রাধা যত করিয়া আঁচলে বাঁধিতে গেলেন, কিন্তু উহা যেন অগাধ জলে পড়িয়া হারাইয়া গেল। এইভাবে কতকগুলি ঘরোয়া উপমা দিয়া কবি রাধার মনের অপরিসীম দুঃখকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।”

৬.৮। চণ্ডীদাসের পদে ভাবসম্মিলন

বৈষ্ণব সাহিত্যের মুখ্য উপজীব্য বিষয় প্রেম এবং তার আশ্রয় রাধা ও কৃষ্ণ। ভক্ত বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে একজন নায়কশ্রেষ্ঠ স্বয়ং ভগবান,

অন্যজন তাঁরই আনন্দাংশজাত হ্লাদিনী শক্তির পরমা প্রকাশ। বৈষ্ণব সাহিত্য তাঁদেরই দিবা প্রেমের লিপিকা। প্রেমগীতি বৈষ্ণবপদাবলীর স্তরবিন্যাসও অতি সুন্দর। পূর্বরাগ - অনুরাগ - অভিসার - রসোদ্গার মান - মানান্তে মিলন - প্রেমবৈচিত্ত্য - আক্ষেপানুরাগ - মাথুর – ভাবসম্মিলন প্রভৃতি। ভাবসম্মিলন কী? শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন জনিত কারণে সমগ্র বৃন্দাবন অন্ধকার হয়ে পড়ে। শূন্য বৃন্দাবনে বিরহার্ততিে শ্রীমতী রাধা দীর্ণ হয়ে পড়েন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আর ফিরে আসেননি। তখন কৃষ্ণের ধ্যানে রাধা তন্ময়তা প্রাপ্ত হন। ভাবরাজ্যে কৃষ্ণের মিলিত হন। এই মিলনের নাম ভাবসম্মিলন। এই মিলন বাস্তব মিলন নয়, ভাবাবেগে কল্পনার রাজ্যে মিলনতৃপ্তির সঞ্চার।

ভাবসম্মিলনের আলোচনা প্রসঙ্গে ড. শ্রীমন্তকুমার জানা তাঁর ‘বৈষ্ণবসাহিত্য সমীক্ষা’ গ্রন্থে লিখিছেন- “পদাবলী সাহিত্যে ভাবসম্মিলন শব্দটি সম্ভোগ রসপর্যায়ের সর্বশেষ পর্যায়। বৈষ্ণবীয় মধুর রসের সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ-ভেদে দুটি শ্রেণী। সম্ভোগের চারটি শ্রেণী হল- সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান। প্রবাস-বিপ্রলম্ভের পর যে সম্ভোগমিলন, তাকে বৈষ্ণব তত্ত্বজ্ঞেরা সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ বলছেন। কারণ, এই মিলন-সুখ দেহে-নির্ভর নয়। এই সমৃদ্ধিমান সম্ভোগকে ভাবসম্মিলন বলা হয় এজন্য যে, প্রেমচিন্তায় বহির্বলা নায়িকা বাস্তববুদ্ধি হারিয়ে ভাব-কল্পনায় নায়কের সঙ্গে সম্মিলনের অপার্থিব আনন্দ অনুভব করেন। বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্বে এই সন্মিলনকে ‘ভাবোল্লাস’ বা ‘ভাবসন্মিলন’ বলা হয়েছে।”

ভাবসম্মিলন প্রকৃতপক্ষে মনোমিলন, বিরহের পরিণত পর্যায়ে কৃষ্ণতন্ময়াবস্থা। এখানে বিচ্ছেদ নেই, পেয়ে হারানোর হাহাকার নেই। এখানে শুধুই মিলন, অপার্থিব অনন্ত মিলন। ভাবসম্মিলনের পদ বিদ্যাপতিতেই শুরু। চন্ডীদাসও রাধার প্রেমে পরিতৃপ্তি বর্ণনায় ভাবসম্মিলনের অপার্থিব মাধুর্য ফুটিয়ে তুলছেন। তাঁর ভাবসম্মিলনের অপূর্ব পদটি হল-

‘বহু দিনি পরে বঁধুয়া এলে।

দেখো না হইত পরাণ গেলে।।

এতেক সহিল অবলা বলে।

ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে।।

দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।

মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল।।

এ সব দুখ কিছু না গণি।

তোমার কুশলে কুশল মানি।।

এ সব দুখ গেল হে দূরে।

হারাণ রতন পাইলাম কোরে।।

এখন, কোকিল আসিয়া করুক গান।

ভ্রমরা ধরুক তাহার তান।।

মলয় পবন বহুক মন্দ।

গগনে উদয় হউক চন্দ।।

বাশুলী আদেশে কহে চন্ডীদাসে।

দুখ দূরে গেল সুখ-বিলাসে।।'

কৃষ্ণ মথুরা থেকে রাধার মনোরাজ্যে ফিরে এসেছেন। রাধার অনন্ত বিরহ-যন্ত্রণার অবসান ঘটেছে। তাঁকে ফিরে পেয়ে শুনিয়েছেন তাঁর অন্তহীন দুঃখবেদনার কথা। পাষাণের পক্ষেও সম্ভব হত না সেই কষ্ট সহ্য করা। নারী বলেই তাঁর পক্ষে সম্তব হয়েছে। তবু নিজের দুঃখকে তিনি বড়ো বলে মনে করেন না। কৃষ্ণের সুখেই তাঁর সুখ। যাই হোক কৃষ্ণ ফিরে আসায় তাঁর সকল দুঃখ-কষ্টের অবসান হয়েছে। সবচেয়ে বড়ো কথা আর তাঁকে দুঃখ-যন্ত্রণা পেতে হবে না, আর তাঁকে কৃষ্ণহারা হতে হবে না। আজ মনের গহনে পবিত্র ভাবের রাজ্যে তিনি কৃষ্ণকে পেয়েছেন একান্তভাবে। শুধু প্রেমিকা নয়, প্রেম-আরাধিকা রাধার চরিত্র এখানে স্পষ্ট। চণ্ডীদাস সহজ সরল অথচ আবেগবাহী ভাষায় রাধার কৃষ্ণপ্রেমের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন পদটির চরণে চরণে । বস্তুত, ভাবে ও রসে ভাবসম্মিলনের পদগুলি বৈষ্ণবসাহিত্যে অনন্যসাধারণ

সংযোজন । বদিগ্ধ সমালোচক অধ্যাপক ড. অসতিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লখিছেনে - "ভাবসন্মলিনরে পদগুলরি আবগেরে নষ্ঠিা ও রসরে বচৈত্রি্য বশিষেভাবে লক্ষণীয়। কারণ এই পদসমূহে বরিহ ও মলিনরে রস একসঙ্গে মলিতি হইয়াছ। কৃষ্ণরে মথুরাগমনরে পর রাধা ও কৃষ্ণরে আর মলিন হয় নাই বটে, কন্তিু বষ্ণিব ভক্ত কবগিণ এই বরিহরে হাহাকারে কমেন করয়িা সমাপ্তরি রখো টানবিনে? তাই তাঁহারা ভাবসন্মলেন বা ভাবোল্লাস নামরে এক পৃথক পর্যায়রে পরকিল্পনা করয়িাছনে। ভাবলোকে, মনোজগতে কল্পনার আকাশে শ্রীরাধা কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করয়িা মনে করতিছেনে, যনে কৃষ্ণ সত্যই দীর্ঘ বরিহরে ব্যবধানরে পর তাঁহাকে গ্রহণ করতিছেনে চারদিকি তাহারই শুভ সূচনা। কন্তিু পদকর্তা এ নর্মিমতা সহ্য করবিনে কি করয়িা? তাই এই পর্যায়রে পদে রাধা-কৃষ্ণরে কাল্পনকি মলিনরে চত্রি আঁকয়িা তাঁহারা লীলারসরে উপসংহার করয়িাছনে।"

৬.৯। অনুশীলনী

১। বষ্ণিবপদালবী সাহত্যি 'পূর্বরাগ' ও 'অনুরাগ' কাকে বলে? 'পূর্বরাগ' পর্যায়রে শ্রষ্ঠে কবি কে? তাঁর পদগুলরি ভাবসৌন্দর্য বশি্লষেণ করুন।

২। 'পূর্বরাগ' শব্দটরি তা□পর্য বশি্লষেণ করে এই পর্যায়রে পদবলীতে লৌককি ব্যাকুলতা কমেন করে আধ্যাত্মকি ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ হয়ছে লখিুন।

৩। আক্ষপোনুরাগরে পদ রচনায় চন্ডীদাসরে কৃতত্বি বচিার করুন।

৪। অভসিার কাকে বলে ? এই পর্যায়রে কাব্যমূল্য বচিার কর।

৫। 'চন্ডীদাস সহজ ভাষায় গভীর ভাবকে প্রকাশ করতে পরেছেনে।'- তাঁর পদ অবলম্বনে আলোচনা করুন।

৬। পূর্বরাগরে সঙ্গে অনুরাগরে তফাত কোথায়? পাঠ্যতালকিাভুক্ত পূর্বরাগরে একটি পদরে কাব্যসৌন্দর্য বশি্লষেণ করুন।

৭। 'সই, কমেনে ধরবি হয়িা / আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়/ আমার আঙনিা দয়িা' - পদটি কোন্ পর্যায়রে? পদটরি মর্মবস্তু ব্যাখ্যা করুন।

৮। বষ্ণিব পদাবলীতে 'ভাবসম্মলেন' কোন্ বশিষে অর্থে ব্যবহৃত হয়? এই পর্যায়ভুক্ত একটি পদরে কাব্যসৌন্দর্য ব্যাখ্যা করুন।

৯। প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগের মধ্যে তফাত কোথায়? ‘পিরিতি বলিয়া এ তিনি আখর/ আর না বলিব মুখে’- কোন্ পর্যায়ের পদ? পদটির বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করুন।

১০। অভিসার কাকে বলে? অভিসারের লৌকিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়ে পাঠ্যতালিকাভুক্ত পদটির বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করুন।

৬.১০। গ্রন্থপঞ্জি

১। সুকুমার সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (প্রথম খণ্ড)।

২। ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়)।

৩। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড)।

৪। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড) ।

৫। বিমানবিহারী মজুমদার : ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য।

৬। বিমানবিহারী মজুমদার : পাঁচশত ব□সরের পদাবলী ।

৭। বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত : চন্ডীদাসের পদাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষ□)।

৮। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : পদাবলী পরিচয় ।

৯। শঙ্করীপ্রসাদ বসু : চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি।

১০। মিহির চৌধুরী কামিল্যা : নির্বাচিত বৈষ্ণবপদাবলী : পাঠ ও আস্বাদন।

১১। সনাতন গোস্বামী : বৈষ্ণব পদাবলী।

১২। ক্ষেত্র গুপ্ত : বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস।

একক: ৭: চণ্ডীদাসের পদাবলীর বিভিন্ন দিক বিচার

বিন্যাসক্রম

৭.১। চন্ডীদাসের পদে রাধা চরিত্র

৭.২। বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাসের তুলনা

৭.৩। চন্ডীদাসের পদের ভাষা

৭.৪। চন্ডীদাসের পদের ছন্দ ও অলংকার

৭.৫। অনুশীলনী

৭.৬। গ্রন্থপঞ্জি

৭.১। চন্ডীদাসের পদে রাধা চরিত্র

বৈষ্ণব পদাবলীর মূল উপজীব্য রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। কবি জয়দেবে এর সূচনা, পরবর্তী কালে তার বিস্তার। কবিকুল সুনিপুণ দক্ষতায় রচনা করেছেন অপূর্ব সেই প্রেমগাথা। অধ্যাত্মতত্ত্ব বিজড়িত হলেও এই প্রেমগাথা মানবিক সম্পর্কের আধারেই বিন্যস্ত। রাধা যেন এক মর্ত্যনারী, কৃষ্ণ অনুরাগে যাঁর হৃদয় চঞ্চল উদ্বেল। সেই উদ্বেলতার চিত্র আমরা দেখি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ, বিদ্যাপতির পদসম্ভারে। বিদ্যাপতির রাধা যেন অতিসচেতন এক নাগরিকা, ছলাকলায় নিপুণা এক নায়িকা। মাথুরবিরহ এবং ভাবসম্মিলনের পদগুলি বাদ দিলে বিদ্যাপতির রাধাকে আমরা পার্থিব কামনা বাসনাময়ী নারী হিসাবেই দেখতে পাই। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর রাধাও রক্তমাংসের সঞ্জীবিতা প্রাণোচ্ছলা এক পার্থিব নারী। ব্যতিক্রম 'বংশীখণ্ড' ও 'রাধাবিরহ' অংশ। 'বংশীখণ্ড' এর রাধার সঙ্গে পদাবলীর উ□কণ্ঠিতা নায়িকা রাধার প্রভেদ প্রায় নেই বললেই চলে, আর 'রাধাবিরহ' অংশে তিনি হয়ে উঠেছেন অশ্রুভারাতুরা আত্মনিবেদিতা এক নিষ্ঠিকি প্রেমিকা। পদাবলীর চন্ডীদাস কিন্তু তাঁর রাধাকে আগাগোড়াই পার্থিব স্থূলতা থেকে মুক্ত করে সম্পূর্ণ এক ভিন্নতর রূপ দান করেছেন। তাঁর রাধা

কৃষ্ণগতপ্রাণা আত্মনিবেদিতা এক প্রেমসাধিকা। তাই তিনি যৌবনেও যোগিনী, তপস্বিনী।

চন্ডীদাসের রাধা ছলনাময়ী নন, বিলাসকলায় পারদর্শিনী নন, বিদগ্ধা নাগরিকা নন, আবার ভগবান কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিও নন, তাঁর রাধা নিতান্তই সহজ সরল এক গ্রাম্যবধূ। কৃষ্ণপ্রেমে তিনি পাগল, কৃষ্ণনাম শ্রবণে হন আবেগব্যাকুল। কৃষ্ণপ্রাপ্তি কামনায় তাঁর ব্যাকুলতাময় আর্তি– 'জপিতে জপিতে নাম অবশ করিলি গো। কেমনে পাইব সই তারে।' প্রেমগভীরতায় তিনি আপনহারা, বাহ্যজ্ঞানহীনা। শ্যামময় তাঁর জগ□। তাই তো ঘনকৃষ্ণ মেঘে, আপন কাজল কালো চুলে, যমুনার কালো জলে কৃষ্ণের বর্ণসাদৃশ্য দেখে ভাব-বিভোর হয়ে পড়েন। কৃষ্ণের শিরোদেশে স্থিত মুকুটে শোভা পায় ময়ূরের পালক। শ্রীমতী রাধা তাই ময়ূর - ময়ূরীর কণ্ঠদেশের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন, কৃষ্ণশোভা দর্শনের তৃপ্তিলাভ করেন। রাধার শ্যামময় ভুবনে সমাজ, সংসার, গুরুগঞ্জনা সব কিছুই তুচ্ছ। আসলে তিনি যে কৃষ্ণের প্রতি গভীর ভালোবাসায় সর্বস্ব বিকিয়ে দিয়ে বসে আছেন।

শুধু পূর্বরাগ নয়, আক্ষেপানুরাগের পদেও চণ্ডীদাস রাধার অপরূপ রূপচিত্র অঙ্কন করেছেন। এই পর্যায়ের পদে চন্ডীদাস এক অসহায়া প্রেমোন্মাদিনী রমণীর মানসিক যন্ত্রণাকে স্পষ্টরেখে করে তুলেছেন। যার প্রেমে রাধা সর্বস্ব খুইয়েছেন; বাহিরকে ঘর, ঘরকে বাহির করেছেন সেই প্রিয়তম আজ তাঁর প্রতি উদাসীনতায় নিষ্করুণ। কান্নায় ভেঙে পড়েন রাধা, আক্ষেপে ঝরে পড়ে তাঁর অশ্রুসিক্ত বচনে। কখনও নিজের প্রতি ও কখনও কৃষ্ণের প্রতি, কখনও বংশীর প্রতি, কখনও সখীর প্রতি, কখনও প্রেমের প্রতি, কখনও বা বিধাতার প্রতি আক্ষেপে ফেটে পড়েন। আক্ষেপানুরাগের পদগুলিতে চন্ডীদাস রাধার হৃদয় বেদনা ও অন্তঃদ্বন্দ্ব ক্ষতবিক্ষত রূপের অতি বাস্তবচিত্র অঙ্কন করেছেন।

'যত নিবারিয়ে চাই নিবার না যায় রে।

আন পথে যাইতে সে কানুপথে ধায় রে।।'

কিংবা

'কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান।

অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা বিনে।’

অথবা

‘পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর

ভুবনে আনিল কে।

মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইলুঁ

তিতায় তিতিল দে।’

প্রভৃতি পদে চন্ডীদাস রাধার আক্ষেপ-মন্থিত-হৃদয়ের অনুচ্চ ক্রন্দন, অনুতাপ, অন্তর্জ্বালাকে মর্মস্পর্শী ভাষায় পাঠকহৃদয়ে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। চণ্ডীদাসের রাধা যেন সর্বংসহা। তাই তো নিদারুণ দুঃখাভিঘাতেও তিনি কারও প্রতি কোনো রূপ কটু ভাষা প্রয়োগ করেননি । শুধুই আত্মবিলাপ করে বলছেন-

‘সই কেমনে ধরিব হিয়া।

আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়

আমারি আঙিনা দিয়া।।’

গালিগালাজ নয়, কটুকাটব্য নয়, মর্মবেদনায় প্রতিনায়িকার উদ্দেশ্যে তিনি শুধু বলছেন-

‘যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙ্গাইয়া

এমতি করিল কে॥

আমার পরাণ যেমতি করিছে

তেমতি হউক সে।।’

কখনও আত্মঅনুশোচনা করে বলছেন-

‘সখি কে বলে পিরিতি ভাল।

হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিয়া

কাঁদিতে জীবন গেল।।’

আবার কখনও বা সকরুণ কণ্ঠে প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে বলছেন-

'বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।

মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও।।'

এই হলেন চন্ডীদাসের রাধা, যাঁর মধ্যে খরদীপ্ত নায়িকাজনোচিত উজ্জ্বল্য নেই, কোনোরূপ জটিলতা কুটিলতা নেই, বিদ্বেষ ভাব ভাবনা নেই, খণ্ডিতা নায়িকার রোষবহ্নিও নেই। তাঁর রাধা মৃদুভাষিণী সরলা এক গ্রাম্য বধূ - যাঁর রূপ সুস্নিগ্ধ, তুলসী গন্ধবাসিত, হৃদয় কুসুমের ন্যায় কোমল - পেলব। বস্তুত, চন্ডীদাসের রাধা চরিত্রের প্রতিতুলনা সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে একেবারেই দুর্লভ। অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলছেন- "শ্রীরাধা চরিত্রের জন্য কবি ও সাধক চণ্ডীদাস যে অপার্থিব উপাদান অবলম্বন করেছেন, সমস্ত স্থূলতাকে অতি সূক্ষ্ম মীস্টিক (ভক্তি) আবরণে ঢেকে ফেলেছেন, তার সমতুল্য উদাহরণ মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে বিশেষ পাওয়া যায় না। রাধাকে তিনি যেন মর্ত্য থেকে বহু দূর দুর্গম অধ্যাত্ম তীর্থে স্থাপন করেছেন। তাঁর কাছে শ্রীরাধার কৃষ্ণের প্রতি আসক্তি শুধু মাত্র প্রেমের আকর্ষণ নয়, তা যেন দেশকাল হীন অনন্ত আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, অধ্যাত্ম জীবনের সঙ্গে অন্বিত। ....। বস্তুতঃ চন্ডীদাসের শ্রীরাধার প্রেম অস্মিতা বিলোপের সাধনা, বৃহত্তর জীবন-উপলব্ধির সাধনা, যেখানে 'কামগন্ধ নাহি তায়।' চন্ডীদাস সরল কথায়, সহজ ত্রিপদী ছন্দে, অতি সাধারণ অলঙ্কার ব্যবহার করে রাধার অন্তঃব্যথাকে সুপরিস্ফুট করেছেন, আবার সবটা ব্যক্তও হয়নি। কারণ এই প্রেম তো মর্ত্যের রূপক-প্রতীকে ফুটিয়ে তোলা যায় না। রাধা যখন বলেন -

'কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোক

তাহাতে নাহিক দুখ।

তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার

গলায় পরিতে সুখ।।'

তখন কি মনে হয় না, এ শুধু প্রেমের কবিতা নয়, এ হলো ভাগবতী উপলব্ধি? বাস্তবিক বিশ্বের প্রেমাশ্রিত ভক্তি সাহিত্যে চন্ডীদাসের রাধা চরিত্রের

সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। রাধা চরিত্রের সব চেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল - এর ব্যঞ্জনা। কয়েকটি আভাস-ইঙ্গিতে কবি রাধার সূক্ষ্ম ভাবাবেগ ফুটিয়ে তুলেছেন। ব্যঞ্জনা যদি শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ হয়, তবে চন্ডীদাস রাধা-চরিত্র পরিকল্পনায় সে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারেন।"

৭.২। বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাসের তুলনা

প্রাক চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে যে দুটি নাম অবিসংবাদিতভাবে উচ্চারিত হয়, সে দুটি হল - বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতিকেই মুখ্যত বৈষ্ণব পদসাহিত্যের আদি কবি বলে অভিহিত করা হয়। ড. সুকুমার সেনের ভাষায়- "বাঙালি বৈষ্ণবগীতিকবিদের রচনায় আদর্শ ছিল বিদ্যাপতির গান, এ বিদ্যাপতিকে মিথিলার বিশেষ একজন রাজকবি মনে করা উচিত হইবে না। এখানে 'বিদ্যাপতি' এক ধরনের গীতি-রচয়িতা কবিদের সাধারণ নাম। এ কবিদের মধ্যে মৈথিল ছিল, বাঙালি ছিল সম্ভবতঃ নেপালিও ছিল। তবে তাহাদের মধ্যে উল্লেখ্যেতম যিনি তিনিই আমাদের জানা কবি, 'সপ্রকরিসদুপাধ্যায়' বিদ্যাপতি ঠাকুর।"

বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাস দুই কবির পদাবলীই শ্রীচৈতন্যদেব অতি আনন্দের সঙ্গে আস্বাদন করতেন। বিদ্যাপতির কাব্যভাষা ব্রজবুলি, আর চন্ডীদাসের পদাবলীর ভাষা বাংলা। তবে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে নিয়ে নানা সমস্যার অবতারণা হলেও এঁরা যে প্রাকচৈতন্যযুগের কবি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই দুই কবিকে নিয়ে একটা প্রচলিত জনশ্রুতি হল - বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাসের মধ্যে কোন একসময় মিলন ঘটেছিল।

বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার রাজসভাকবি। তিনি ব্রজবুলি ছাড়াও মৈথিলি, সংস্কৃত এবং অবহট্ট ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থ লিখেছেন; বিদ্যাপতি ছিলেন পাঞ্চোপাসক স্মার্ত পন্ডিত। তাঁর পান্ডিত্য, বৈদগ্ধ্য, নাগরিকতাবোধ প্রশ্নাতীত। অন্যদিকে চন্ডীদাস সম্পর্কে প্রায় তেমন কিছুই জানা যায় না। যেটুকু জানা যায় তা হল - বীরভূম জেলার নানুর গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম । তিনি ছিলেন বাসুলী দেবীর উপাসক; কিন্তু কাব্যের বিচারে তাঁকে রাধাকৃষ্ণে নিবেদিত প্রাণ ভক্তবৈষ্ণব ছাড়া অন্য কিছুই ভাবা যায় না। তাঁর মতো আত্মবলিোগী ভাবতন্ময় কবি স্বভাব বিরল। তাঁর পদাবলীর নিরলঙ্কার সহজ সরল ভাষা বড়ই মর্মস্পর্শী, রবীন্দ্রনাথ বলেন-

"আমাদের চন্ডীদাস সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি, এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি। তিনি এক ছত্র লেখেন ও দশ ছত্র পাঠকদের দিয়া লিখাইয়া লন।

'এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা কেমনে আইল বাটে?
আঙ্গিনার কোণে তিতিছে বঁধুয়া দেখিয়া পরাণ ফাটে।'

রাধা যা কহিল তাহা ত সামান্য, কিন্তু রাধা যা কহিল না তাহা কতখানি!

' সই কেমনে ধরিব হিয়া?
আমার বধুয়া আন বাড়ি যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া।
যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙাইয়া
এমতি করিল কে?
আমার পরাণ যেমতি করিছে
সেমতি হউক সে।'

বিদ্যাপতি সুখের কবি, চন্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চন্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চন্ডীদাস প্রেমকেই জগ□ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চন্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চন্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় এবং দুঃখের প্রতিও অনুরাগ । বিদ্যাপতি কেবল জানেন যে মিলনে সুখ ও বিরহে দুঃখ, কিন্ত চন্ডীদাসের হৃদয় আরো গভীর, তিনি উহা অপেক্ষা অধিক জানেন। তাঁহার প্রেমে 'কিছু কিছু সুধা বিষগুণ আধা'......"

'কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনি সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি দুখ যায় তার ঠাঁই।।'

এটা সত্য যে, বিদ্যাপতি নাগরিক প্রেমের কবি। তাঁর সৌন্দর্য সম্ভোগ, রূপতৃষ্ণা, যৌবনমত্ততা, পুরবিলাস, ভোগাকাঙ্ক্ষা থাকলেও তাঁর প্রেমের

গভীরতা ও অন্তর্ভেদী অনুভবকে অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। জীবন ও অভিজ্ঞতার নিরিখে বিদ্যাপতির আপন অনুভব ও প্রজ্ঞার আলোকে তাঁর রাধা তাই ক্রমশ রূপজ-দেহজ প্রেমকে অতিক্রম করে অরূপের জগতে পাড়ি দিয়েছে; সে আরূপ-অনুভব এক আধ্যাত্মিক ভাবলোকে উন্নীত হয়েছে।

তবে বিদ্যাপতির প্রথম পর্বের রচনার মধ্যে প্রেমের তেমন দহন-জ্বালা নেই। শ্যামের সঙ্গে রাধার মিলনে বিদ্যাপতির রাধা বলেন-

‘দারুণ ঋতুপতি যত সুখ দেল।
হরিমুখ হেরইতে সব দূর গেল।।
ভণহ বিদ্যাপতি আর নহ আধি।
সমুচিত ঔখদে না রহে বেয়াধি।।’

কিন্তু চন্ডীদাসের রাধাশ্যাম মিলনেও ‘দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া’ তাঁদের কিছুতেই যেন তৃপ্তি নেই-

‘নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি।

কিংবা, রাধার মনে হয়-

‘কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।।
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি।।
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর।।’

বিদ্যাপতির রাধাও তেমনি বলেন-

‘সখি রে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।।

জনম অবধি হাম রূপ নহোরনু

নয়ন না তিরপিত ভেল।।

সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু

শ্রুতিপথে পরশ না গেল।।

কত মধুযামিনী রভসে গোঙায়নু

না বুঝনু কইছন কেলি।।

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু

তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।।

যত যত রসিকজন রস-অনুমগন

অনুভব কহে না দেখে ।।

বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে

লাখে না মিলিল একে।।'

বিদ্যাপতির এই পদটির হৃদয়ার্তির সঙ্গে চন্ডীদাসের পদগুলির তুলনা হতে পারে। চন্ডীদাস 'পরীতি'র ব্যথা বোঝনে, আস্বাদ বোঝোন, 'পরীতি' যে সহজসাধ্য নয় তাও বোঝনে। সেই সুদুর্লভ 'পরীতি'র স্বরূপ অনুসন্ধান করতে করতে তিনি একসময় বিশ্ববোধের দ্বারে এসে উপনীত হন-

'পরীতি পরীতি সব জন কহে

পরীতি সহজ কথা।

বিরিখির ফল নহে ত পরীতি

নাহি মিলে যথাতথা।।'

সে 'পরীতি' কন্টক হলেও 'পরাণ পুতলী সম' অত্যন্ত প্রিয়। বিদ্যাপতির প্রেমভাবনা কখনও এই পর্যায়ে উন্নীত হয় নি।

বিদ্যাপতির রাধা যেমন অল্পে অল্পে মুকুলিত হয়ে উঠছে, যেমন প্রাণোচ্ছল, যৌবনমদে মত্ত, রূপ-রসে আন্দোলিত, যেমন বাকপটু,

রূপসচেতন, নাগরিক যৌবন-চপল, দেহসম্ভোগ-আর্ত; চন্ডীদাসের রাধা সেখানে যোগিনী, আজন্ম কৃষ্ণগতপ্রাণ, কৃষ্ণতন্ময়, কৃষ্ণপ্রেমের হ্রাসবৃদ্ধিহীন চন্দ্রকলা। তাঁর রাধার 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ।' সমালোচক দীনেশচন্দ্র সেন চন্ডীদাসের এই রাধার ভিতরেই শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বাভাস দেখেছিলেন। চন্ডীদাস নিজেই ছিলেন রাধাভাবে ভাবিত। তাই দেহের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। এক সুতীব্র বিরহবোধ চন্ডীদাসের মনে চিরজাগরুক ছিল বলেই পূর্বরাগের পর্যায় থেকে ভাবসম্মিলনের পর্যায় সর্বত্রই বিরহের সুর - এটাই চন্ডীদাসের বৈশিষ্ট্য। তাঁর রাধা বলেন-

'বঁধু কি আর বলিব আমি।

জীবনে পরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈও তুমি।।

তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।

সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী।।

এ কুলে ও কুলে দুকূলে গোকুলে আপনা বলিব কায়।

শীতল বলিয়া শরণ লইনু ও-দুটি কলম পায়।।'

বিদ্যাপতির রাধা চন্ডীদাসের রাধার মতো আজন্মসাধিকা যোগিনী নন। যৌবন ধর্মের স্বাভাবিক আকর্ষণে তিনি নিজে রূপবতী বলেই রূপবান কৃষ্ণকে কামনা করেন। বিদ্যাপতির পদে তাই লৌকিক প্রেমচেতনাই মুখ্য। বিদ্যাপতি রূপদক্ষ কবি, চন্ডীদাস ভাবদক্ষ কবি, শিল্পচেতনায় বিদ্যাপতি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। চন্ডীদাসের তুলনায় বিদ্যাপতির কাব্যে তাই আলংকারিতা অনেক বেশি স্পষ্ট। ছন্দের চারুতা, শব্দনৈপুণ্যে তাঁর পদাবলী স্বতন্ত্র মর্যাদার দাবিদার। কিন্তু চন্ডীদাস সহজ সরল ভাব-ভাষায়, সহজ ছন্দ-অলংকারে সহৃদয়তার সঙ্গে নিবেদন করেছেন তাঁর পদাবলী। তাঁর রাধা অহংশূন্য হয়ে শ্রীকৃষ্ণ পদে নিজেকে সমর্পণ করেছেন-

'কানু-অনুরাগে-এ দেহ সঁপিলু তিল তুলসী দিয়া।'

বিদ্যাপতির 'প্রার্থনা'র পদও এই ভাব জাতীয়। কিন্তু মৌলিক পার্থক্যটি হল - বিদ্যাপতি স্বয়ং নিজেকে তিল-তুলসী দিয়ে মাধব চরণে আত্মসমর্পণ

করছেনে। তাঁর উদ্দশ্যে - মোক্ষলাভ; আর রাধার উদ্দশ্যে 'কৃষ্ণরতি' অর্থা□ কানু-অনুরাগ। তথাপি স্বীকার করতে হয়, দহেবাদী কবি বিদ্যাপতিও ক্রম-পরণিতরি পথে অগ্রসর হতে হতে কৃষ্ণচরণে সমর্পণরে আকুল আর্তি জানয়িছেনে-

'কত চতুরানন মরি মরি যাওত

ন তুয়া আদি অবসানা।

তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত

সাগর-লহরী সমানা।।'

রবীন্দ্রনাথরে ভাষায় বলা যায়- "বদ্যিাপতরি কবতিায় প্রমেরে ভঙ্গি। প্রমেরে নৃত্য, প্রমেরে চাঞ্চল্য চন্ডীদাসরে কবতিায় প্রমেরে তীব্রতা, প্রমেরে আলোক।"

৭.৩। চন্ডীদাসরে পদরে ভাষা

চন্ডীদাস সহজ ভাবরে, সহজ প্রকাশরে কবি। সহজ সুরে এবং উপলব্ধরি সারল্যে তনি আজও বাঙালরি প্রাণরে কবি। অন্যান্য বষ্ণিব কবগিণ যক্ষেত্রে আলংকারকি চাতুর্য, শব্দ-ছন্দ-মণ্ডনকলার উপরে বশিষেভাবে নর্িভরশীল, চন্ডীদাস সক্ষেত্রে নতিান্তই সহজ সরল। তাঁর কবতিার ভাষা বাংলার গ্রামজীবনরে ভাষা। একান্ত সহজ সরল গ্রাম্য জনজীবনরে আটপৌরে ভাষায় তনি পদ রচনা করছেনে। অথচ তাঁর পদে প্রসাদগুণরে অভাব নইে। বলা যতে পার, অনলংকৃত অটপৌরে ভাষায় মর্মবদেনার এতবড়ো প্রকাশকার বাংলা সাহত্যি কমই দখো যায়। শাস্ত্ররে ঝাড়াই-বাছাই বা বশেভূষার দকিে তনি নজর দনেনি। তবুও তাঁর পদরে মর্মস্পর্শতিা অতুলনীয়। তাঁর পদরে আবদেন অসামান্য। তা 'কানরে ভতির দয়িে মরমে' প্রবশে কর, আকুল ব্যাকুল করে তোলে মন-প্রাণ। শ্রদ্ধয়ে সমালোচক দীনশেচন্দ্র সনে চন্ডীদাসরে কবতিার মর্মে প্রবশে করে লখিছেনে - "চণ্ডীদাসরে বাণী সহজ, সরল ও সুন্দর। বদ্যিাপতরি পূর্বরাগরে 'ক্ষণে-ক্ষণে নয়ন কোনো অনুসরই। ক্ষণে ক্ষণে বসনধুলি তনু ভরই।' প্রভৃতি বর্ণনায় ঈষদুদ্ভন্নিযৌবনা রাধকিার রূপ উছলয়িা পড়তিছে, কন্তিু সইে পূর্বরাগরে অবস্থা চত্রিতি করয়িা চন্ডীদাস যে ধ্যানপরায়ণা রাধকিার

মূর্তিটি দেখাইয়াছেন, তাহার সাশ্রুনেত্রে আমাদিগকে স্বর্গীয় প্রেমের স্বপ্ন দেখাইয়া অনুসরণ করে এবং চৈতন্য-প্রভুর দুটি সজল চক্ষুর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সেই মূর্তি ভাষার পুষ্পপল্লবের বহু ঊর্ধ্বে নির্মল অধ্যাত্মরাজ্য স্পর্শ করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছে। সেই স্থানে সাহিত্যিক সৌন্দর্যের আড়ম্বর নাই। কিন্তু তাহা প্রেমের নিজের স্থান। এখানে শব্দের ঐশ্বর্য অপেক্ষা শব্দের অল্পতাই ইঙ্গিতে বেশী কার্যকরী হয়। প্রকৃত প্রেমিক বড় স্বল্পভাষী, এখানে উচ্চভাবের শোভা অবগতির জন্যই যেন ভাষার শোভা তনু ত্যাগ করে এবং বাহ্য সৌন্দর্যের বাহুল্য না থাকিলেও মন্ত্রপূত কোটী হৃদয়ের অন্তঃপুর উদঘাটিত করিয়া দেয়।”

‘সহজ কথা যায় না বলা সহজে’। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন - “সহজ ভাষার, সহজ ভাবের, সহজ কবিতা লেখাই শক্ত; কারণ তাহাতে প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে হয়। আর বড় বড় কথার মোটা মোটা ভাবের কবিতা লেখা সহজ কারণ প্রাণের মধ্যে প্রবেশ না করিয়াও তাহা পারা যায়।” অথচ চন্ডীদাস কী সহজেই না সহজ কথা, সহজ ভাষার বাঁধনে মর্মস্পর্শী হৃদয়-বেদনাকে বাণীরূপ দিয়েছেন, তাঁর গভীর অনুভূতিকে হৃদয়ে হৃদয়ে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। যখন রাধাভাবে তন্ময় চন্ডীদাস আকুল কন্ঠে বলে ওঠেন – ‘সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম’ তখন তা পাঠকমনেও সাড়া জাগায়, শ্যামনামের মাধুর্য পাঠকের ‘কানের ভিতর দিয়া মরমে’ প্রবেশ করে। আবার, চন্ডীদাস তাঁর পদে বলেছেন যতটুকু, ভাব ব্যঞ্জিত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন - “আমাদের চন্ডীদাস সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি, এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি। তিনি যে সকল কবিতা লেখেন নাই তাহারই জন্য কবি। তিনি একছত্র লেখেন ও দশ ছত্র পাঠকদের দিয়া লিখাইয়া লন।”

কবিতায় শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চন্ডীদাস লোকভাষাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বাঙালির ভাষা, বাঙালির গীতি সেইসব শব্দকে আশ্রয় করে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। লোক শব্দগুলি কবির প্রয়োগ নৈপুণ্যে কাব্যরূপ লাভ করেছে। কৃষ্ণের রূপ ও স্বভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যবহৃত ‘কালা’, ‘বিনোদ বঁধুয়া’, ‘রসের সাগর’, ‘রসশিরোমণি’, ‘বাঁশীয়া নাগর’, ‘কালোমাণিকের মালা’, ‘পরাণ পুতলী’, ‘চিকন দেহো’, ‘চাঁচর চিকুর’, ‘গুণের নিধি’, ‘নাটের গুরু কালা’ প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ; প্রেমের রূপ তথা তার দুঃখ ও

সুখের রূপ বোঝাতে ব্যবহৃত – ‘পিরীতি আরতি’, ‘বিষম-পিরীতি’, ‘ছার পিরীতি’, ‘পিরীতি সায়র’, ‘পাপ পিরীতি’, ‘পিরীতি আঠা’ প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ; রাধার ব্যাকুলতা, অসহায়তা, পুলক, আবেগ, প্রভৃতি হৃদয়ভাবের প্রকাশার্থে ব্যবহৃত ‘প্রাণ করে উচাটন’, ‘দরশ-লালসে’, ‘চিতে বেয়াকুল’, ‘সোয়াস্তি নাই’, ‘দগধে পরাণ’, ‘সোঙরি’, ‘প্রাণ আনচান’, ‘হিয়া বিদরিয়া’, ‘পরের অধিনী’, ‘মরিয়া মরি’, ‘ননদী দারুণ বাদী’, ‘ননদিনী জ্বালা’ প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ আমাদের আকৃষ্ট করে। এইসব শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কবি তাঁর অসাধারণ শব্দচয়ন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এসব কথা বাঙালির মনে মনে, মুখে মুখে ফেরে। এইসব লোকভাষাকে কবি তাঁর পদাবলীতে প্রয়োগ করেছেন পরম আন্তরিকতায়, অনুপম দক্ষতায়।

৭.৪। চন্ডীদাসের পদের ছন্দ ও অলংকার

ছন্দ নির্মাণের ক্ষেত্রেও চন্ডীদাসের নন্যতা লক্ষণীয়। যে সময় পয়ার ছিল কবিতার অন্যতম ছন্দোবাহন, সে সময় চন্ডীদাস বেশির ভাগ পদই রচনা করেছেন ত্রিপদীতে এবং তাঁর পদাবলীতে ব্যবহৃত ত্রিপদী প্রধানত মধ্যমিল যুক্ত। ত্রিপর্বিক চরণ সাধারণত ৬ + ৬ + ৮ মাত্রা সমন্বিত। প্রাচীন ক্রিয়াপদ ও স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের ব্যবহারে এবং শাব্দিক অনুপ্রাসের সুর ধ্বনিত হওয়ায় তাঁর পদ হয়েছে গীতিকাব্যের আবেদন-সমৃদ্ধ। রাধাভাবে তন্ময় কবির হৃদয়াকূতি যখন সহজ ত্রিপদী ছন্দে প্রকাশিত হয় -

‘সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো

আকুল করিল মোর প্রাণ।।’

তখন তা পাঠকের মর্মে নাড়া দেয়, জাগায় হৃদস্পন্দন। বাস্তবিকই চন্ডীদাসের ভাষাভঙ্গিমার মতো ছন্দপ্রকরণও সাদাসিধে ও আবেগবাহী।

কাব্য-সাধনায় অলংকার শাস্ত্র প্রাধান্য আমাদের দেশে সুপ্রাচীনকাল থেকেই। এমনকি স্থূল ভাষা-শব্দে আড়ষ্ট বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ - কাব্যের সর্বাঙ্গেও অলংকারের ছড়াছড়ি। বিদ্যাপতির পদাবলীতেও ‘সাহিত্য দর্পণ’-এর প্রভাব লক্ষণীয়ভাবে বর্তমান । জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাসের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু চন্ডীদাস

মন্তব্য

ব্যতিক্রম যাঁর সৃষ্টিতে কাব্যিক পূর্ব সংস্কারের ছায়াপাত ঘটেনি। তিনি সহজ সুরে গভীর কথা বলেছেন একান্ত নিজস্ব ভঙ্গিতে। তিনি যে অলংকার প্রয়োগ করেননি, তা নয়। কিন্তু সেই অলংকারেও দৈনন্দিন জীবনের ছবি স্পষ্ট। বস্তুত, সহজতার সাধনাই চন্ডীদাসের সাধনা। অলংকার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তাঁর সেই বিশিষ্ট্যতার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

আবার, কবি তাঁর হৃদয়ানুভূতি প্রকাশে বা রাধার মানসিক সংকট, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, দুঃখ-বেদনা, লজ্জা-সংকোচ ইত্যাদি ভাবপরিস্ফুটনে এমন কিছু অলংকার প্রয়োগ করেছেন যেগুলি প্রায় প্রবাদ-বাক্যের মর্যাদা লাভ করেছে, সুদীর্ঘ কাল ধরে মানুষের মুখে মুখে সঞ্চরণ করে চলেছে। যথা – ‘কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি ঘষিতে সৌরভময়’; ‘গড়ন ভাঙিতে সই আছে কত খল, ভাঙিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল’; ‘শঙ্খ বণিকের করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে’; ‘মধুর বলিয়া যতনে খাইলুঁ’, তিতায় তিতিল দে’; ‘পাপ পড়শী ডাকিনী সদৃশী’; ‘জল বিনু মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে’; ‘কানুর পিরীতি কুহকের রীতি’; ‘কলঙ্ক কলসী লয়ো ভাসিব পাথারে’; ‘কলসে কলসে সেঁচি না ঘুচে পাথার’; ‘পরবশ পিরীতি আন্ধার ঘরে সাপ’; ‘আমার করম লেখো, দোষ কারে দিব’; ‘পিরীতি-কণ্টক হিয়ায় ফুটিল’; ‘ডাকিয়া শুধায় মোরে হেন জন নাই’ - প্রভৃতি সুভাষিত পঙক্তির মতো উজ্জ্বল। বস্তুত, চন্ডীদাস যথার্থই বাঙালি কবি, যিনি বাংলার মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে এবং নিজের সৃষ্টিকে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দিয়েছেন। শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসু যথার্থই বলেছেন - “চন্ডীদাস তাঁহার বেদনার বাণীকে স্থাপন করিয়াছেন এই বাংলা দেশেরই উপর। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের বাধ্য অনুকারীগণ যেখানে কৃত্রিম আলোকের উ□সব সাজাইয়াছেন, সেখানে চন্ডীদাসের কাব্যের সহজতায় মুক্তির আনন্দ কি বিস্মিত হইবার এই কারণেই চণ্ডীদাসে আমাদের বিশ্বাস। তিনি আমাদেরই কবি, বাংলা দেশের কবি। সৌন্দর্যের দাস নন, সহজের সন্তান।”

৭.৫। অনুশীলনী

১। ‘চন্ডীদাস সহজ ভাষার কবি’ - উদ্ধৃতি সহ আলোচনা করুন।

২। অলংকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে চন্ডীদাসের বিশিষ্টতার পরিচয় দিন।

৩। চন্ডীদাসের কবিত্ব প্রকাশে তাঁর ভাষা ও অলংকার কতটা সাহায্য করেছে তা আলোচনা করুন।

৪। রাধা-চরিত্র চিত্রণে চন্ডীদাসের কৃতিত্ব বিচার করুন।

৫। রাধা চরিত্রটি কীভাবে লৌকিক হতে অলৌকিক প্রেমের স্তরে উন্নীত হয়েছে, চন্ডীদাসের পদ অবলম্বনে তা প্রদর্শন করুন।

৬। 'সহজতম ভাষায় গভীরতম ভাবকে চন্ডীদাস প্রকাশ করতে চেয়েছেন' - আলোচনা করুন।

৭। জ্ঞানদাসকে চন্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলা হয়ে থাকে। অধীত পদ অবলম্বনে এ জাতীয় অভিমতের যাথার্থ্য বিচার করুন।

৮। 'চন্ডীদাসের কাব্যে বিরহ - চেতনা সর্বাত্মক।' - এরূপ বলবার কারণ কী?

৯। 'চন্ডীদাস যথার্থই লিরিকি কবি।' - এই মন্তব্যের উপর আলোচনা করুন।

১০। চন্ডীদাসের পদের অন্তর্গত অনেক কাব্যছত্র প্রবচন রূপ লাভ করেছে। কয়েকটি প্রবচনের উল্লেখ করে সেগুলির প্রসঙ্গ, উপযোগিতা ও ভাবসৌন্দর্য বিশ্লেষণ করুন।

১১। চন্ডীদাসের রাধা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কি? বিদ্যাপতির রাধার সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায় আলোচনা করুন।

১২। 'চন্ডীদাস বাংলাদেশের গণজীবনের কবি।' - আলোচনা করুন।

১৩। চন্ডীদাসের পদের ভাষা-ছন্দ-অলংকার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৭.৬। গ্রন্থপঞ্জি

১। সুকুমার সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (প্রথম খণ্ড)।

২। ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়)।

৩। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড)।

৪। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিতোর ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড) ।

৫। বিমানবিহারী মজুমদার : ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য।

৬। বিমানবিহারী মজুমদার : পাঁচশত ব□সরের পদাবলী।

৭। বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত : চন্ডীদাসের পদাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষ□)।

৮। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : পদাবলী পরিচয়।

৯। শঙ্করীপ্রসাদ বসু : চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি।

১০। মিহির চৌধুরী কামিল্যা : নির্বাচিত বৈষ্ণবপদাবলী : পাঠ ও আস্বাদন।

১১। সনাতন গোস্বামী : বৈষ্ণব পদাবলী।

১২। ক্ষেত্র গুপ্ত : বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস।